চতুর্থ অধ্যায়

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বাংলা নাটক

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বাংলা নাটক

কৃষকদের সমস্যা ও তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নাটক রচনা নতুন কিছু নয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' থেকে সেই যাত্রা শুরু হয়েছে। ঔপনিবেশিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলা নাটকের একটা বড়ো অংশে কৃষক সমস্যা-সংকট উঠে এসেছে। নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল কৃষকদের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই। কৃষকদের অধিকার রক্ষার লড়াই ছিল এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের মূল লক্ষ্য। পরবর্তীতে ছাত্র, যুব ও শ্রমিকশ্রেণি এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগদান করে। ফলে আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রা বিস্তৃত হয়—গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের ডাক দেয়। এই ডাক সেই সময়ের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের মতো নাটককারদের উপরেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। একাধিক নাটক রচনার মধ্যে নাটককাররা নকশাল আন্দোলনের যাবতীয় দিক উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আন্দোলন যত তীব্র হয়েছে রাজনৈতিক লাইনগত বিচ্যুতিও ততই প্রকট হয়েছে। 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর অভিযান পরবর্তীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে তৎকালীন সরকার ও তার প্রশাসন এবং কিছু সমাজবিরোধী গোষ্ঠী নকশালদের 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর অভিযানকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে নকশালদের খতমের অভিযান। ফলে সমাজের সর্বস্তরে শুরু হয় এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া। সাতের দশকের শুরুতে তা প্রকট আকার ধারণ করে। সেসব বিষয়ও নাটকে ধরা পড়েছে।

তীর :

২৫ মে ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়িতে কৃষক রমণী ও শিশুদের উপর নৃশংসভাবে অতর্কিতে পুলিশের গুলি চালানোর পরপরই উৎপল দত্ত 'তীর' নাটকটি রচনা করেন। আমাদের গবেষণার যে পরিধি অর্থাৎ সাতের দশকের নাটক, তাতে সময় বিচারে এই নাটকটি কিছুটা পূর্বের। কিন্তু তবুও এই নাটকের স্থান আমাদের এই অধ্যায়ে দিতে হয়। কারণ নকশালবাড়ির ঘটনা ও তার পথ ধরে রাজনীতির যে টানাপোড়েন সে সময়ের সমাজে সৃষ্টি হয় তার প্রভাব নাটকের মধ্যে বলিষ্ঠভাবে এসে পড়ে। আর 'তীর' নাটকটি

নকশালবাড়ির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত অন্যতম নাটকই শুধু নয়, এটি একদম প্রথম পর্যায়ের নাটকও বটে এবং এই নাটককে কেন্দ্র করে উৎপল দত্তর রাজনৈতিক জীবনেও একটি বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

রাজ্যের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় উৎপল দত্ত রচনা করেছিলেন 'দিন বদলের পালা'। যেটি নির্বাচনের প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গণবিক্ষোভের আগুন তীব্রতর হতে থাকে। আর সেই আগুন লেলিহান শিখায় পরিণত হয় নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলি চালানোর পর থেকে। ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের মতোই উৎপল দত্তর মনেও বিরাগ জন্ম নিতে শুরু করে। নির্বাচনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করলেই শোষণমুক্ত সমাজ গড়া যায়—উৎপল দত্ত কখনই এই ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। এসম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—

> 'গণতান্ত্রিক ভোট ও বামপন্থী সরকার মূলে বিপ্লবীই নয়। দুটো জিনিসই প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধানের চৌখুপিতে আবদ্ধ। তারা স্রেফ বিপ্লবের ধাপ, বিপ্লবের আবশ্যক মধ্যবর্তী পর্যায়। আমরা আমাদের অ্যাজিটপ্রপ কাজকর্মে এমনতর বাড়াবাড়ি দাবি থেকে অত্যন্ত সচেতনভাবে মুক্ত থাকতে চেয়েছি। কোনও কোনও নাটককার আবেগতাড়িত হয়ে এগুলোকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। ভয় পাই, যখন দেখি অনবধানবশত পথ আর গন্তব্য এক করে ফেলেন, এবং জনগণের মধ্যে এই প্রপঞ্চ বিস্তার করেন যে, বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁদের কাজ শেষ হবে। বস্তুত, সবে তখন কাজের সূত্রপাত।'[১]

সেজন্যই দেশের বিভিন্ন গণ-বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলনের মধ্যে উৎপল দত্ত নিজের ঈপ্সিতকে খুঁজেছেন বারবার। একাধিক নাটক লিখেছেন এবং চিনে নিতে চেয়েছেন তার অন্তঃসত্তাকে।

যে আদর্শগত বিচ্যুতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন হয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার সময় দেখা গেল পুনরায় তাদের মধ্যে জোট। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ভেঙে তৈরি হওয়া বাংলা কংগ্রেসও তার মধ্যে ছিল। যা উৎপল দত্তর পছন্দসই ছিল না। ফলে

তিনি ক্রমশ গা ভাসালেন সেই স্রোতে, যা বইছিল সি. পি. আই. (এম.) পার্টির ভিতরেই একদল বিপ্লবকামী কর্মীদের মধ্যে। যাদের মধ্যে ছিল হটকারিতা এবং যারা চেয়েছিল অবিলম্বে সশস্ত্র বিপ্লব। জীবনের এই সময়কে তিনি নিজের 'রাজনৈতিক স্খলন, মোটা দাগের যত সব ভুল দুঃসহ প্রগলভতার পর্যায়' বলেছেন। এর আগে তিনি কোনও পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করে রাজনীতিতে এতটা সক্রিয় কখনই ছিলেন না। যদিও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থক ও সহযাত্রী ছিলেন। এই প্রথম তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে নকশালপন্থী আন্দোলনের নেতা রূপে দেখা গেল। ১৯৬৭ সালে শহীদ মিনারের পাদদেশে নকশালপন্থীদের প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি বক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরে ঐ বছরই ১০ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের শহীদবাগ ময়দানে 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি' কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দেন।[২] জীবনের এই সময়েই তিনি রচনা করেছিলেন 'তীর'—যা প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে।[৩]

উৎপল দত্ত বিভিন্ন লেখায় তাঁর এই সময়ের রাজনৈতিক চর্যা ও 'তীর' নাটক রচনার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। নকশালবাড়ির ঘটনার পরপরই আলোকশিল্পী তাপস সেন ও মঞ্চস্থপতি নির্মল গুহকে সঙ্গে নিয়ে উৎপল দত্ত ক্ষেত্র-সমীক্ষার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, প্রসাদুজোত, আলিপুরদুয়ার যান। কৃষক-যোদ্ধাদের এই লড়াইকে তিনি অমরগাথায় পরিণতি দিতে চেয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সাক্ষাৎকার নেন চারু মজুমদার, সৌরেন বোস ও তিলক রায়ের মতো নকশাল নেতাদের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখা করেন জঙ্গি চাষি, ওঁরাও, রাজবংশী, গোর্খা, বাঙালিদের সঙ্গে। রেকর্ড করেন কৃষক-কমরেডদের গান।[৪] সঞ্চিত এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে ওঠে 'তীর' নাটক।

দীর্ঘ এই নাটকটির কাহিনি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের কিছু পূর্ব সময় থেকে। উত্তরবঙ্গের ওঁরাও, রাজবংশী, সাঁওতাল ইত্যাদি শ্রমিক ও কৃষকদের রোজকার জীবনযাত্রা ও তাদের রিচুয়াল, জোতদারদের শোষণ, রাজনীতির নগ্নরূপ, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিবাদ, নকশাল রাজনীতির বিস্তার এবং তা দমনে সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির তৎপরতার মধ্যে নাটকের বিষয়ের আবর্তন ঘটেছে। প্রথম দৃশ্য অর্থাৎ 'প্রস্তাবনা' অংশেই যেসব সমস্যাগুলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে,

নাটকের পরবর্তীতে সেগুলি বিকাশলাভ করে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। এখানে ধরা পড়েছে—

১. নকশালবাড়ি অঞ্চলের কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরেই জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখী। তারা নিজেদের অস্ত্রে শাণ দিয়েছে জমি রক্ষার তাগিদে। তাই রণবাহাদুর দেবীকে বলে—

> 'কাজ কিন্তু চালিয়ে গেছি, দেবু। দেখো তাকিয়ে—তীর, বল্লম, বলুয়া, ভোজালি ঝকঝক করছে। এবার এক দানা ধান যদি কোনো জোতদার নিতে পারে, তো আমি জীবনে আর ভোজালি ছোঁব না।'[৫]

২. প্রত্যেকটি চরিত্র দর্শকের সামনে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছে তাদের জাতিগত ভিন্নতা বর্তমানে লুপ্ত। কারণ তারা প্রত্যেকে জোতদার বা সরকারের দ্বারা নির্বিচারে শোষিত। তাদের একটিই পরিচয়—কৃষক।

৩. বিচার ব্যবস্থার দৈনতা ধরা পড়ে সোমারির স্বামী দুখুরুর কথায়। যে দেওয়ানি মামলায় ডিক্রী পেয়েছিল। কিন্তু জোতদার সত্যবান সিং ভাগচাষ বোর্ডে মামলা করে তাকে ভাগচাষী প্রমাণ করে উচ্ছেদ করার পক্ষে রায় বার করে নেয়। সেই রায় দুখুরু না মানলে তাকে খুন করে। এর মধ্যে নকশালবাড়িতে ঘটে যাওয়া বিগল কিষাণের কথা মনে পড়ে।

৪. সত্যবান সিং-এর মতো জোতদাররা বেনামে হাজার হাজার বিঘে জমি ও যাবতীয় ফসল দখল ও মজুত করে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। অহিংস আন্দোলনে তার কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না। তখন সমস্ত কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষপাতী। এরকম সময়ে শিবেনের মতো কমিউনিস্ট নেতারা নির্বাচনকে বিপ্লবের প্রথম ধাপ মনে করে নির্বাচনমুখী লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এখানে শিবেন যুক্তি দিয়েছে এই বলে—

> 'আমরা জিতব। সরকারের মধ্যে পর্যন্ত আমরা থাকব।...এখন ধান কাড়তে গেলে পুলিশ আসে; তখন আমরা থাকব মন্ত্রীসভার মধ্যে, পুলিশকে আসতেই দেব না। আর পুলিশের সাহায্য না পেলে ঐ সত্যবান সিংরা

একদিনও টিকতে পারবে? তখন শুরু হবে আরও বড় লড়াই। ধানের লড়াই নয়, জমিরও নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনে রাখবেন, জনতা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল না করলে ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত রাইফেল হাতে নিয়েই ফয়সলা করতে হবে—এটা যেন ভুলবেন না! মুক্ত অঞ্চল ও মুক্ত ফৌজ গড়তে হবে। সেটাই চীনের পথ—মাও-ৎসে-তুং-এর শিক্ষা।'[৬]

৫. অপরদিকে সত্যবান সিং প্রথমে ছিল কংগ্রেস। পরে কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস তৈরি হলে সেই দলে যোগ দেয়।

নাটকটি 'প্রস্তাবনা' নিয়ে মোট ১৪টি দৃশ্যে বিভক্ত। তার মধ্যে ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত দৃশ্যগুলির কোনও নাম নেই। বাকি ১ থেকে ১০ পর্যন্ত দৃশ্যগুলি তার বিষয় অনুসারে নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত। প্রথম থেকেই সাধারণ কৃষকদের ওপর জোতদারদের শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদী মানসিকতা নাটকটির মেজাজকে বিপ্লবী করে তোলে। 'রক্তে বোনা ধান' ও 'বিবাহ' শিরোনামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে সেই জোতদারী শোষণেরই রূপ ফুটে ওঠে। বিভিন্ন উপায়ে, জমা-খরচের খাতা দেখিয়ে পূর্বের বিভিন্ন ঋণের অছিলায় জোতদার সত্যবান সিং কৃষকদের ঠকায় এবং তাদের উপার্জিত টাকা ও ধান থেকে বঞ্চিত করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে। ফলে একদিকে জোতদার সত্যবান সিং নিজের বিলাসী জীবন অতিবাহিত করছে, আর অপরদিকে সাধারণ কৃষকরা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। একদিকে সত্যবান সিং-এর আছে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি, তৈরি হচ্ছে নিজের ছয় নম্বর বাড়ি, অপরদিকে কৃষকরা দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে নিজের শেষ সম্বলও সত্যবান সিং-এর কাছেই বন্ধক রাখছে। এই শোষণই কৃষকদের মনে জোতদারদের প্রতি ক্ষোভ সঞ্চিত করে। সেজন্যই দ্বিতীয় দৃশ্যে গেব্রিয়েলের পাওনা টাকা মেটাতে ত্রুটি করলে সেখানেই সে প্রতিবাদ করে তা আদায় করেছে, আবার সত্যবান সিং-এর খড়িবাড়ি টি-স্টেটে শ্রমিকরা বোনাসের হুমকি ও ধর্মঘটের চোখরাঙানি দেখাচ্ছে।

আগেই বলেছি নির্বাচনের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধানের কথা নাটককার বিশ্বাস করতেন না। সেই ভাবনা নাটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই তা ধরা পড়ে। এখানে মঞ্চের পশ্চাৎপটে ভোটের প্রচার মূলক কতগুলি পোস্টার আঁটা থাকে—

‘বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী সত্যবান সিংকে ভোট দিন!’, ‘যুক্তফ্রণ্টকে ভোট দিন!’, ‘গণবামফ্রণ্টকে ভোট দিন!’, ‘কমিউনিস্ট পার্টিকে (মার্কসবাদী) ভোট দিন!’ যদিও এখানে ‘যুক্তফ্রণ্টকে ভোট দিন!’ এই পোস্টারটা ভুল। কারণ এখানে চতুর্থ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। আর চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফলের আগে যুক্তফ্রণ্টের জোট হয়নি। এই কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সে যাই হোক, সত্যবান সিং-এর মতো শ্রেণিশত্রুরাও নির্বাচনে জিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। জনসভায় ভোটের প্রচারে তারা কৃষক মায়েদের চোখের জল মোছাবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে তাদেরই শোষণ করে। অপরদিকে কৃষকরা দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে তিনটি নির্বাচন দেখেছে, অনেক প্রতিশ্রুতি শুনেছে, কিন্তু শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সেজন্যই তাদের সংলাপে ভোটের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন শুক্রা বলে—

> ‘পেটে দানা না পড়লে ভোট-ভোট বলে চেঁচানো শক্ত। তবু চেঁচালাম আমরা। তীর ধনুক নামিয়ে রাখলাম, বল্লমের ফলায় প্রায় মর্চে ধরে গেল। সবাই বাক্যবাগীশ হয়ে, শুধু কথার জোরে জোতদারকে ঘায়েল করার বিচিত্র পরীক্ষা চালাতে লাগলাম।’[৭]

উপাসু বলে—

> ‘কংগ্রেস দংদঙাচ্ছে—ভয়ে কম্পমান। এ অবস্থায় একখণ্ড চিরচিরি কাগজ, এক ছেন্দা-বিশিষ্ট কাষ্ঠ-নির্মিত বাক্সে নিক্ষেপ করলেই সে নাকালাং-সাকালাং পলায়ন করবে, এটা কি করে হয়? ঠিক বুঝতে পারছি না।’[৮]

রণবাহাদুর থাপা বলে—

> ‘আমাদের রেজিমেণ্টে কেউ তো এসে বলেনি কখনো—ঐ যে শত্রুসৈন্য, তুমি গুলি চালিও না, ভোট দাও! কেউ তো বলে নি, কাগজ নিয়ে লড়াই করো।’[৯]

ভোটের রাজনীতির বিরোধিতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে ‘ভোটমন্ত্র’ নামক পঞ্চম দৃশ্যে। এখানে সি. পি. আই., সি. পি. আই. (এম) প্রভৃতি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ভোট-রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার প্রতিও নাটককার

বিরোধিতা সেধেছেন। প্রসাদুজোত, নকশালবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কোথাও চাল নেই। কারণ সত্যবান সিং-এর মতো জোতদাররা নিজেদের গোলায় চাল মজুত করে বাজারে চালের অভাব তৈরি করেছে। ফলে সানঝো কাঠ বিক্রি করে পয়সা পেলেও তা দিয়ে চাল কিনতে পারে না, সোমারি খাওয়ার জন্য ছয় মাইল দূরে চ্যাঙা নদীর দু'ধারে পাথরের গায়ে যে শ্যাওলা গজিয়ে উঠেছে তা সংগ্রহ করে আনছে, রণবাহাদুর থাপার একাদশ ও অষ্টম সন্তানের খাদ্যের অভাবে এখন-তখন অবস্থা হয়ে আছে। কিন্তু অপরদিকে রাজনৈতিক পার্টিগুলি মূল সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্বাচনের প্রচার করতে ব্যস্ত। তারা স্লোগান দেয়—'ভোট দিন বাঁচতে, তারা হাতুড়ি কাস্তে!', 'ভোট দিবেন কিসে, কাস্তে ধানের শীষ-এ!', 'দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসকে ভোট দিন, ভোট দিন!', 'খাদ্যের জন্য বামপন্থী ফ্রন্টকে ভোট দিন, ভোট দিন!' ইত্যাদি। অথচ ভোট হতে এখনও তিন মাস বাকি। এই দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে তিন মাস অতিবাহিত করবে কীভাবে তার কোনও চিন্তা রাজনৈতিক পার্টিগুলি করেনি। সেজন্যই শুক্রা টুডুর সংলাপে ভোটের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ উচ্চারিত হয়েছে। সে রণবাহাদুরকে একটি ভোটের পোস্টার দিয়ে তা রান্না করে খেতে বলেছে।

নাটকের মূল কাহিনি প্রধানত শুরু হয়েছে 'বিবাহ' নামের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে। যেখানে বৈশাগু কন্যা দেবারীর সঙ্গে জোনাকুর বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত। কিন্তু সত্যবান সিং-এর কুচক্রের জন্য তা সম্পন্ন হয় না। নারীলোলুপ জোতদার সত্যবানের কেরকেটুর সম্পত্তির ওপর দৃষ্টি তো ছিলই, সেই সঙ্গে তার লোলুপতার দৃষ্টি পড়েছিল দেবারীর ওপরও। তাই দ্রুততার সঙ্গে কোর্টে কেরকেটুর সমস্ত সম্পত্তি নিজের ছেলে ও আত্মীয় পরিচয় দিয়ে আকালু নামক কুকুরের বলে প্রমাণ করেছে এবং কেরকেটু ও তার পরিবারকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছে। যে জমি সে দখল করেছে সেই জমির নামে পূর্ব থেকেই মামলা চলছিল। আর সেই মামলার রায় কেরকেটুর দিকেই আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আদালতের এই বিপরীত রায়ের ফলে জোনাকুর আর বিয়ে হয়না। এখানে দেশের বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু পরে দেবারী জোনাকুকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে এসে ওঠে কেরকেটুর ঘরে। কারণ তার বাবা বৈশাগু তাকে সত্যবানের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। এই দেবারী একজন শিক্ষিতা নারী। সে মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং-এর বই পড়ে। তার মনে আছে বিদ্রোহের তীব্র ঝংকার। সেই

ঝংকার সে ক্রমশ জোনাকুর মনে বাজাতে চেয়েছে। অবশ্য জোনাকুর মনেও ছিল শ্রেণিশত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা। কিন্তু লড়াইয়ের সঠিক পন্থা তার জানা ছিল না। এখানে তাকে সাহায্য করেছে দেবারী। তাই যখন জোনাকু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে সত্যবান সিংকে মারার জন্য 'হাওয়া ট্যাপা বাণ' প্রস্তুত করছিল তখন দেবারী তাকে চিনিয়েছে ও জানিয়েছে লেনিন, মাও সে তুং-এর কথা। কারণ সে জানে বাণ মেরে সত্যবান সিংদের মত শ্রেণিশত্রুদের হাত থেকে রেহায় পাওয়া যাবে না। মানুষকে রাজনীতি সচেতন হতে হবে। নাটককার দেবারীকে শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন করার পাশাপাশি তাকে নিজের শ্রেণির প্রতি দয়াবানও করে তুলেছেন। সেজন্যই যখন সে জানতে পেরেছে সানঝো সারাদিন কিছু খায়নি এবং তার ঘরে প্রত্যেকে অভুক্ত তখন সে তার ভাগের ভাত সানঝোর হাতে তুলে দিয়েছে।

দুর্ভিক্ষময় পরিস্থিতিতে জর্জরিত সকলেই যে নির্বাচনের আশায় দিন গুনছিল, অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে পড়ে। কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে, শিবেন মন্ত্রী হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের সমস্যা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করেছে। ভোটের ফলাফলের খবর পেয়ে নাটকের কৃষক ও কৃষক রমণী চরিত্রদের সংলাপে তা প্রকাশিত—

'উপাসু : কংগ্রেসের তিরপাতিরপি শেষ। ঢিপিরি পেটা কংগ্রেসিরা পলায়ন করিতেছে। কংগ্রেস হেরে ভূত। শিবেনদা মন্ত্রী হয়েছেন।

...

খজুয়া : হ্যাঁ, ভেতর থেকে লড়বে শিবেন, বাইরে আমরা। মনে আছে বলে—বলে গিয়েছিল?

রণবাহাদুর : আমার অষ্টম সন্তান তেজবাহাদুর থাপা তাহলে বেঁচে গেল?

বির্সা : (মংলুকে চাঁটি মেরে) এবার থালা থালা ভাত খাস, কিস্যু বলবো না।

জোনাকু : (দেবারীকে) আমার বাণেই হোলো! (দেবারী মুখ ফিরিয়ে নেয়।)

গেব্রিয়েল : এবার তাহলে বিপ্লব শুরু! শিবেনদা বলে গিয়েছিল!

বির্সা : শালা সত্যবান সিং-এর গুদাম ভেঙে চাল বার করে নেব এবার।

...

শুক্রা : রাতের আঁধার কোথাও নেই। উত্তরের পাহাড়ের চূড়ায় আলো এসে পড়েছে। পাহাড়ের চূড়ার তুষার-রাশি সূর্যালোকে লাল হয়ে উঠেছে।'[১০]

কিন্তু তারা যখন ভোরের স্বপ্ন দেখছে, তখনই নাটকে ভেসে ওঠে আর একটি ছবি—যেখানে সত্যবান সিং-এর সঙ্গে শিবেন করমর্দন করছে। এখানে শিবেনের দ্বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। একদিকে সে সত্যবানকে আলিঙ্গন করে ছবি তোলে, রিপোর্টারের সামনে জোতদার-মজুতদারদের হৃদয় পরিবর্তনের আশার কথা বলে। আবার অন্যদিকে দেবীদাসকে বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং জনগণের বিপ্লব দমন করতে পুলিশ আসবে না বলে প্রতিশ্রুতিও দেয়। যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

নাটকের গতি ক্রমশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। 'মাও-ৎসে-তুং-এর চিন্তা' শিরোনামের সপ্তম দৃশ্যটি এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নকশাল আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল মাও সেতুঙ-এর বৈপ্লবিক চিন্তা। চারু মজুমদারের আটটি দলিল সহ নকশাল আন্দোলনের অন্যান্য দলিল, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর গঠনতন্ত্র, কর্মসূচি, যাবতীয় ইস্তেহারে মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রভাব লক্ষ করার মতো। এসব বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। নাটকের এই অংশে তারই এক নাটকীয় রূপ পরিবেশিত। এখানে দেখা যায় ফারুক কামারশালায় বির্সার তদারকিতে লড়াই করার জন্য তীর তৈরি করছে। রণবাহাদুর থাপা সানঝো, গেব্রিয়েল, মংলু ও উপাসুকে লড়াই করার 'ট্রেনিং' দিচ্ছে এবং দেবীদাস ক্লাস নিচ্ছেন গাংগী, গজুয়া, ফাগুনি, সোমারি, জোনাকু ও দেবারীর। সমস্ত ক্লাসের বিষয় আবদ্ধ থেকেছে মাও সেতুঙ-এর 'রেড বুক'-এর মধ্যে। জনযুদ্ধের দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ 'Take small and medium cities and extensive rural areas first; take big cities later'[১১]-এর ব্যাখ্যা নাটককার সাধারণ কৃষক রমণী গাংগীর মুখে করিয়েছেন সহজ-সরলভাবে। বাঘ যেমন

হাতি শিকার করার সময় সামনে থেকে না গিয়ে পিছন থেকে একটা একটা পায়ে আঘাত করে করে হাতিকে দুর্বল করে অন্তিমে মাথায় আঘাত করে ঠিক তেমন ভাবেই হাতিরূপ সরকারের পা-রূপ গ্রামগুলিকে আগে দখল করে অন্তিমে তার মাথা শহরকে আক্রমণ করতে হবে। এভাবেই তাদের শিক্ষার পরিসর তৈরি করেছে দেবীদাস। জনযুদ্ধের যে দশটি নীতির কথা মাও সেতুঙ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন সেই নীতিগুলি পরপর দেবারীকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কারণ আগেই বলেছি দেবারী শিক্ষিত, বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত। দশটি নীতি উচ্চারণের পর বাকিদের আত্মবল দৃঢ় করতে সে বক্তব্য রাখে—

> ‘শত্রু হল কাগুজে বাঘ। অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের শেষ ফয়সলা হয়না; যে-লোকটা অস্ত্র ধরেছে, সে-ই যুদ্ধের জয়-পরাজয় ঠিক করে। আমরা বহু, আমাদের মনে আছে জোর; আমরা লড়ছি নিজেদের জীবনের জন্য, দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। ওদের ক’টা ভাড়াটে সৈন্য পারবে না। তাই অস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়।’[১২]

মাও সেতুঙ-এর শিক্ষার পাশাপাশি এখানে ভারতের বর্তমান অবস্থার কথা উঠে এসেছে। স্বাধীনতার নামে শাসকের পালাবদল, অধিকার আদায়ের নামে সত্যাগ্রহ, ধর্না, ভোট রাজনীতি আসলে সাধারণ গরীব জনগণের কোনো উন্নতিই করেনি। এসব কথা বলে সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণি কেবল শোষণই করে গেছে। অথচ অধিকার আদায়ের জন্য জনগণ যখন স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন করেছে তখন শাসকশ্রেণি তা দমনে অহিংসার বদলে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। সেজন্যই তারা আর সেই পন্থায় আস্থা রাখতে পারেনি। সশস্ত্র বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছে, শ্রেণিশত্রুদের ঘৃণা করতে শিখেছে। এখানে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, বিপ্লবের সময় নিজেদের মধ্যে শ্রেণিসম্পর্ক দৃঢ় করার কথা। সেজন্যই গাংগী, গজুয়া ও শনিচারিয়া এবং দেবারী ও জোনাকুর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল তা নিজেরা মিটিয়ে নিয়ে নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছে।

সামাজিক শোষণে অবদমিত চরিত্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের পর নাটকে এসেছে সেই শিক্ষার প্রয়োগভিত্তিক রূপ। সেই সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধের চেষ্টা। নাটকের অষ্টম দৃশ্যটির নাম ‘বিদ্রোহ’। দৃশ্যটিতে ধরা পড়েছে অভ্যুত্থানের প্রাথমিক রূপ এবং গেরিলা অ্যাকশনের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য। চারিদিকে মাদল

ও নাকাড়ার শব্দে শোষিত জনগণ সত্যবান সিংদের মতো জোতদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের হুংকারের বাণী হয়েছে 'চাষী মজুর এক হও! আপন হাতে রাজ নাও!'[১৩] এই পরিস্থিতিতে সত্যবান সিংও যথেষ্ট সন্ত্রস্ত। সে নিজের সমস্ত গচ্ছিত চাল শহরে চালান করতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি। তার বাড়িতে বিপ্লবী পরিষদের প্রতিনিধি হয়ে গেব্রিয়েল, রণবাহাদুর ও শনিচারোয়া এসেছে। তারা বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে সত্যবানকে জানিয়েছে যে, তার স্বনামে-বেনামে গচ্ছিত দুহাজার বিঘা জমি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, সত্যবানকে তারা 'বদমায়েস জমিদার' আখ্যা দিয়ে তাকে কোনও রকম সুযোগ না দেওয়ার কথা বলেছে; তৃতীয়ত, তার বাড়িতে যে পাঁচটি বন্দুক, তিন হাজার কার্তুজ এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র আছে সেগুলি বিপ্লবী পরিষদের হাতে তুলে দিতে বলেছে, চতুর্থত, তার স্ত্রী ও পুত্রের জন্য সম্বৎসরের খোরাকি রেখে বাকি সমস্ত মজুত করা চাল তারা নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে এও জানিয়েছে যে, দীর্ঘদিন ধরে সত্যবান সাধারণ জনগণকে শোষণ করে যে বৃহৎ অট্টালিকা তৈরি করেছে সেটিও তাকে ছাড়তে হবে। অর্থাৎ সমস্ত দিক থেকে উচ্ছেদ করার কথা বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করেছে। এই সমস্ত কথা জানিয়ে গেব্রিয়েল, রণবাহাদুর ও শনিচারোয়া সেখান থেকে চলে যায়। এরপর সত্যবানের মধ্যে এক স্বার্থপর শোষকের চরিত্র ধরা পরে। সেই রাত্রে সত্যবান নিজের জীবন ও আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। যে পাঁজিয়ার, রবিরাম সহ অন্যান্য ভৃত্যরা আজীবন তার সেবা করে এসেছে—তাদের প্রাণ বাঁচানোর কোনও কথা সত্যবান চিন্তা করেনি। এমনকি নিজের সন্তান জীমূতকে ছেড়েই সে পালাতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করে না। তার কাছে নিজের আধিপত্য বজায় রাখাই ছিল প্রাথমিক এমনকি একমাত্র তাগিদ। সেজন্যই জীমূতের থেকেও শেয়ারের কাগজ, মামলার ডিক্রি, জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদের নোটিশ ইত্যাদি কাগজপত্র বোঝাই বাক্সগুলি বেশি গুরুত্বের হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত গেরিলা অ্যাকশনের অতর্কিত আক্রমণে সত্যবান কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু দেউনিয়া বৃক্ষ রায়ের সহযোগিতায় জীমূতকে সঙ্গে নিয়ে সত্যবান পালাতে সক্ষম হয়। আর এদিকে বির্সা, শনিচারোয়া, গাংগী, দেবারী, শুক্রা সহ বাকি সকলে সত্যবানের বাড়ির সমস্ত সম্পত্তি দখল করেছে। সেই সব সম্পত্তির জৌলুষ দেখে অনেকেই আকৃষ্ট হয়। তাদের এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে মাও সেতুঙ-এর জনযুদ্ধের নীতিকে সামনে রেখে বৃহৎ উদ্দেশ্যের স্বার্থে। শ্রেণিশত্রুর সম্পত্তি

দেখে যাতে কেও মোহাচ্ছন্ন না হয়, সেজন্য বির্সা এখানে সকলকে জনযুদ্ধের তিনটি শৃঙ্খলার নীতি মনে করিয়ে দিয়েছে—

> 'অহো, ভ্যালেন্টেরিয়ার!...তিনটে শৃঙ্খলার নীতি আছে—সবাই জানে—আবার বলে দিচ্ছি! এক, লড়াইয়ের সময়ে হুকুম মানবে। দুই, জনতার কাছ থেকে একটি ছুঁচ বা এক টুকরো সুতোও নেবে না। তিন, লড়াইয়ে যেসব মাল হাতে আসবে, সব—সব—পরিষদে জমা দেবে।'[১৪]

উৎপল দত্তের এই নাটকটির যাবতীয় রাজনৈতিক লাইনও আবদ্ধ থেকেছে মাও সেতুঙ-এর চিন্তার মধ্যে। মাও সেতুঙ নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিনিয়ত সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা করার। একটা ঘরে যদি প্রতিদিন ঝাঁট না দেওয়া যায় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে ধুলো জমে, ঠিক সেরকম ভাবেই পার্টির মধ্যে যদি প্রতিনিয়ত আলোচনা ও আত্মসমালোচনা না করা হয় তাহলে তা সংশোধনবাদের শিকার হয়ে পড়বে।[১৫] নাটকেও দেখি প্রাথমিক বিদ্রোহে সাফল্য লাভের পর বিপ্লবী পরিষদের সদস্যরা মিটিং করেছে। তাদের পরবর্তী কর্মসূচি নির্দিষ্ট করেছে। দেবী বলেছে—

> 'তাই আমাদের কাজের তরিকা হবে এই—মাঠে লাল ঝাণ্ডা পুঁতে, আমরা সব জমি একসঙ্গে হাল দেব। পঁচিশ-ত্রিশটি হাল একধারসে চাষ দিয়ে যাবে। ফসল উঠবে, এক গোলায়—কিষান সমিতির গোলায়, বিপ্লবী পরিষদের গোলায়—গভীর জঙ্গলের মধ্যে। পরে ভাগ হবে।'[১৬]

নকশালবাড়ির এই কৃষক বিদ্রোহ সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের শাসক ও শোষক নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে তারা একজোট হন। নাটকের নবম দৃশ্য 'প্রতিধ্বনি'-তে তাই দেখা যায় পুঁজিপতি, জোতদার, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, এমনকি সি. পি. আই. (এম.) পর্যন্ত সকলেই এক জায়গায় এসে মিশেছে। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণির বর্তমানে মূল শত্রু নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান। ফলে প্রত্যেকে এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে—

> 'পুঁজিপতি : চীনের গুপ্তচররা নকশালবাড়িতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাচ্ছে—

জোতদার : পাকিস্তান থেকে প্রেরিত কিছু গুপ্তচর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে নকশালবাড়িতে—

কংগ্রেসি : সীমান্ত অঞ্চলে এই উপদ্রব যে চীন ও পাকিস্তানের চররাই লাগিয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ কেন্দ্রীয় সরকারের নেই—

পত্রিকা : উত্তরবঙ্গ সীমান্তে নুতন চীনা হামলার প্রস্তুতি!

...

শিবেন : নকশালবাড়ি অঞ্চলে যারা আন্দোলন চালাচ্ছে তারা চীন বা পাকিস্তানের গুপ্তচর নয়। তারা আমেরিকার গুপ্তচর, সি-আই-এ'র এজেন্ট!'[১৭]

এই সমস্ত বিরুদ্ধ প্রচারের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে চায় যে, নকশালবাড়ি আন্দোলন আসলে সুস্থ সমাজের কাছে প্রতিবন্ধক এবং তা অচিরে ধ্বংস করতে না পারলে দেশের ভূমিব্যবস্থা, গণতন্ত্র, সমাজব্যবস্থা সমস্ত কিছুই ধ্বসে যাবে। সুতরাং যেভাবেই হোক তা দমন করা প্রয়োজন। নাটকের পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে সেই দমন এবং তার প্রতিরোধে বিদ্রোহী কৃষকদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ দর্শিত হয়েছে।

'জনতার পুলিশ' নামের দশম দৃশ্যটি নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলি চালানোর প্রেক্ষিতে রচিত। নকশাল আন্দোলনের প্রভাব উত্তরবঙ্গে প্রবল হয়েছে। চা-শ্রমিক এবং কৃষকরা জোটবদ্ধ হয়ে জমি দখল করছে। সত্যবান সিং-এর শিলিগুড়ির বাড়িটি পুলিশ ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের জয়েন্ট কম্যান্ডের দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সত্যবান সিং, চা বাগানের মালিক সুন্দর চৌধুরী এবং জয়েন্ট কম্যান্ডের অমরবাবু সহ অন্যান্য অফিসার, লেফটেনান্ট সকলের আন্দোলনের গতি রদ করার পরিকল্পনা তৈরি করছেন। কলকাতা থেকে গোপনীয় নির্দেশ এসেছে—

'নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে দেখিবামাত্র গুলি করিতে, এবং গুলি করিয়া হত্যা করিতে, জরুরী, গোপনীয় নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে! কানু সান্যাল, কেশব

সরকার, জঙ্গল সাঁওতাল, খোকন মজুমদার, কদম মল্লিক, মুজিবর রহমান, আব্দুল কাদের, দেবীচরণ দাস।'[১৮]

এখানে নকশালবাড়িতে ইন্সপেক্টর সোনাম ওয়াংদির প্রসঙ্গ এসেছে—যে ২৪ মে তীরের আঘাতে মারা যায়। কিন্তু নাটককার এই ঘটনাকে নাটকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, তীরের আঘাত লাগার পরও ইন্সপেক্টর জীবিত ছিল। কিন্তু তাকে মারা হয়েছে বিনা চিকিৎসায়। চন্দনার সংলাপে শুনি—

'তার বউটা আজ সারা বিকাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরেছে—অনুমতি করুন, আমি স্বামীকে কলকাতা নিয়ে যায় প্লেনে। পেট থেকে তীরটা বারই করে নি এখানকার হাসপাতালে। অথচ কলকাতা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পায়নি।'[১৯]

নাটককারের এই উপস্থাপনের কারণ তিনি এখানে পুলিশ প্রশাসনকে এক চক্রান্তকারী শক্তি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে রাজনৈতিক নাটকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণিশত্রুদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করা। নাটককার যখন এই নাটকটি রচনা করছিলেন তখন তিনি যে নকশালবাড়ি আন্দোলনে একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। আর এই আন্দোলনে শ্রেণিশত্রু হিসেবে সরকারি আধিকারিক, পুলিশ ইত্যাদি সেই সকল লোক যারা সরকারের পাশে থেকে, সরকারের কাজকর্ম করে সরকারকে শক্তিশালী করে তাদেরকেও শ্রেণিশত্রু হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল—একথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং নাটককারেরও উদ্দেশ্য ছিল তাই—নকশালবাড়ি আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন। এই সমর্থনের সূত্রেই নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনাকে এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশের কাজকর্ম ও অভিযানকে আরও নৃশংসভাবে দেখিয়েছেন। পুলিশ যেদিন নকশালবাড়িতে গুলি চালিয়েছিল সেদিন কৃষক রমণীরা সেখানে একটি রাজনৈতিক সভা করছিল। কিন্তু নাটককার এখানে দেখিয়েছেন নাটকের বিদ্রোহী কৃষক রমণীরা একটি লৌকিক উৎসব 'তিস্তাবুড়ির পুজো' উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিল। এবং সেই আচার অনুষ্ঠানের মাঝেই পুলিশ প্রথমে গজুয়াকে অপহরণ করে এবং অতর্কিতে আত্মেশরী, দেবারী, সোমারি ও তার পিঠে বাঁধা শিশু সহ আটজন নারীকে গুলি করে হত্যা করে।

এরপর নাটকের অগ্রগতিতে দেখা যায় একদিকে নকশাল আন্দোলনের গতি আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনও নৃশংসভাবে তা দমন করার চেষ্টা চালিয়েছে। নাটকের পরবর্তী ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪—এই চারটি দৃশ্যের কোনও শিরোনাম নেই। এগুলিতে মূলত শাসক শ্রেণির অত্যাচার, দমন এবং তা প্রতিরোধে আন্দোলনকারীদের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দেখানো হয়েছে। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে হত্যার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গে সশস্ত্র মিছিল ও ধর্মঘট লাগাতার চলছে। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন অপহৃত গজুয়ার উপর নৃশংস অত্যাচার করেও তার মুখ থেকে কোনও তথ্য বার করতে পারেনি। তাই সত্যবানের পরামর্শে বির্ষা ওঁরাও এর সন্তান মংলুকে অপহরণ করে। নাটকের অন্তিমে দেখা যায় কৃষকদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান পুলিশ পেয়ে যায় এবং সেখানে মংলুকে নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিল কেবল বির্ষা, সানঝো ও শনিচারোয়া। ফলে সমগ্র দলের সন্ধান পাওয়ার জন্য সকলের সামনেই মংলুর উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, যাতে দুর্বল হয়ে তারা সমস্ত তথ্য দিয়ে দেয়। যা হয়না। এখানে বৈপ্লবিক বীরত্ব ফুটে উঠেছে।–

> ‘সত্যবান : সানঝো ওরাইন! মা হয়ে ছেলের যন্ত্রণা লাঘব না করাটা কি ভদ্রতা? ছেলের চেয়ে বিপ্লব বড়?
>
> ...
>
> সানঝো : ছেলেকে তোমার কাছে বেচে দেব কেন? মাথা হেঁট করে ও তোমাদের গোলাম হয়ে বাঁচবে কেন? তার চেয়ে মরে যাক। বিপ্লবী মাথা উঁচু রেখে মরে যাক।’[২০]

তাদের এই বৈপ্লবিক দম্ভকে ভাঙতে পুলিশও আরও নৃশংসতা অবলম্বন করে। বির্ষাকে রাইফেলের সঙিন দিয়ে হত্যা করে, সানঝোকে ধর্ষণ করতে উদ্ধত হয়। উৎপল দত্তের ‘বিপ্লবী থিয়েটার’-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি নাটককে সংগ্রামী জনগণের অসহায় অবস্থায় বা তাদের পরাজয়ে সমাপ্ত করেন না। এই নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই শেষপর্যন্ত দেখা যায় পুলিশ অফিসার সরোজ সানঝোকে ধর্ষণ করতে যাবে এমন অবস্থায় কৃষক বিপ্লবীরা সেখানে সশস্ত্র অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং তাদের তীরে সরোজ ভূপতিত

হয়। তাদের গেরিলা যুদ্ধে পুলিশ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়, কিন্তু সত্যবান ধরা পড়ে। নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে কৃষকদের এই চিরশত্রু জোতদার সত্যবানের মৃত্যুতে।

রাজরক্ত :

সাতের দশকের সূচনালগ্নে নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছিল সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' (১৯৭১) নাটকটি। ১৯৭০ সালে 'বহুরূপী' পত্রিকায় নাটকটি প্রথমে 'গিনিপিগ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটি পড়া মাত্রই বিভাস চক্রবর্তী প্রযোজনার সংকল্প নেন। প্রযোজনা কালেই অশোক মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে নাটকটির নাম পরিবর্তন করে 'রাজরক্ত' রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ জানুয়ারি থিয়েটার ওয়ার্কশপ দ্বারা 'রঙ্গনা' থিয়েটারে এটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল।[২১]

নাটকে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে আছে তিনজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী সহ মোট চারজন। আলাদা কোনও নামে কোনও চরিত্র চিহ্নিত হয়নি; পুরুষ তিনজন প্রথম, দ্বিতীয় ও ছেলেটি নামে এবং স্ত্রী চরিত্রটি মেয়েটি নামে চিহ্নিত হয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম-কে প্রধানত দেখা যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার চালিকাশক্তির ভূমিকায় অভিনয় করতে এবং দ্বিতীয় হয়ে উঠেছে তার আজ্ঞাবাহী দাস। যারা বর্তমান অবস্থাটা যে কোনও উপায়ে টিকিয়ে রাখতে চায়—হয় চাবুক দিয়ে, নয় বুলেট দিয়ে। আর ছেলেটি ও মেয়েটি সর্বশক্তি দিয়ে জগদ্দল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত করতে চায়। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় তারা সর্বদা শোষিত হয়ে এসেছে। নাটকটির মূল বিষয় আবদ্ধ থেকেছে শাসক ও শাসিতর অথবা শোষক ও শোষিতর ক্ষমতা দখল করার খেলায়। যা ছিল নকশাল আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।

নাটকের শুরুতে প্রথম ও দ্বিতীয়-এর সংলাপে সে সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রটি ধরা পড়ে।–

'দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের পাঠশালায় অগ্নিসংযোগ।

প্রথম : শান্তি সেনানীর প্রহরায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট।

প্রথম : রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরীতে লক-আউট।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের ক্ষেত-খামার জবর দখল।

প্রথম : জবর দখল নিবারক জব্বর আইন চালু।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের দপ্তরে দপ্তরে কর্মবিরতি।

প্রথম : রাজাসাহেবের বিদ্রোহী কর্মীদের ছাঁটাই।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের গ্রামে-গঞ্জে ঝাণ্ডা আর ঝাণ্ডা।

প্রথম : সবার ওপরে রাজাসাহেবের ডাণ্ডা আর ঠাণ্ডাঘর।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের রাজপথে ছুরি, বোমা।

প্রথম : রাজাসাহেবের হাতে টিয়ার গ্যাস আর গুলি।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের রাজ্যে রাজপুরুষ হত্যা।

প্রথম : রাজাসাহেবের রাজ্যে নারীপুরুষ হত্যা।

দ্বিতীয় : রাজাসাহেবের রাজ্য আজ রক্তাক্ত।

প্রথম : রাজাসাহেবের হাত আজ রক্তাক্ত।'[২২]

অ্যাবসার্ড রীতির এই নাটকে কাহিনি অংশ তেমন বিস্তৃত নয়। রাজাসাহেবের অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে। বারবার রাজ্যে বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়। ছেলেটি মানে শোষিত সমাজের যে একটি অংশ সে বারংবার রাজাকে হত্যা করার প্রয়াস করেও ব্যর্থ হয়। তার সমস্ত রকম অভিসন্ধি রাজা ও তার অনুগামীরা বিফল করে দেয়। কিন্তু তবুও সে পরাজয় মানে না। এভাবেই নাটকের গতি সঞ্চারিত হয়ে পরিণতিতে ছেলেটি সঠিক পন্থার সন্ধান পায়। মেয়েটি হয়েছে তার প্রেমিকা তথা তার চলার পথের অন্যতম সহায়ক।

নাটকটি দুটি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম দৃশ্যেই স্পষ্ট হয় রাজা সর্বদা চায় তার ঘর তথা রাজ্যের মধ্যে যে জিনিসটা যেমনভাবে আছে সেটা তেমন ভাবেই সেখানে রাখতে। রাজাসাহেবের রাষ্ট্রচালনার বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না; বরং বদলে সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, সেই রাজ্যে তারা সুখী। অন্যথায় আছে চাবুক, নয় তো 'বুলেট'। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। যেখানে মুক্তমনা শিক্ষার বদলে কেবল মুখস্ত বিদ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের পারদর্শী করানো চলে। নকশাল আন্দোলনে সেই প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছিল। নাটককারও এখানে তার বিরুদ্ধে অবস্থান করছেন।–

'প্রথম : আসলে পড়াশুনোটা কী জানো—এক ধরণের অ্যাসেসমেন্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পারো—আপনি কী শেখাচ্ছেন? উত্তর হল আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেও একটা কিছু শিখেছিল—তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন। বুঝেছ?

ছেলেটি : হ্যাঁ স্যার।–এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ লাইফ।

প্রথম : আহা ঐ ফের ভুল করলে। (ছেলেটিকে থাপ্পর মারে) এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অব এডুকেশন—যার মানে হচ্ছে রিপিটিশন অব রিপিটিশন।'[২৩]

ছেলেটি ও মেয়েটি একে-অপরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ। তারা চায় সুন্দর করে বাঁচতে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থকষ্ট। এর জন্য দায়ী যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তা বুঝতে তাদের বাকি থাকে না। সেজন্য মেয়েটি চায় তারা অনেক দূরে চলে যাবে; যাতে রাজাসাহেব তাদের খুঁজেও না পায়। কিন্তু ছেলেটি জানে পালিয়ে রাজাসাহেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। তাই সে রাজাসাহেবকে হত্যা করার সংকল্প নিয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তিতে ছেলেটি একক প্রয়াসে একটি কাল্পনিক ছুরি উঁচিয়ে রাজাসাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং সেই অপরাধে আদালতে তার বিচার হচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয় ছেলেটি ও মেয়েটির জেলবন্দি অবস্থা দিয়ে। রাজাসাহেবকে হত্যার প্রয়াস করার অপরাধে আদালতের বিচারে তাদের এই শাস্তি। তারা এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি চায়। সেজন্য কখনও কারারক্ষীকে মিনতি করেছে তো কখনও সংবাদপত্রের অফিসে ফোন করেছে। কিন্তু কেও রাজাসাহেবের বিরুদ্ধে যেতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত রাজাসাহেবই তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায় নিজেরই কাজ করানোর উদ্দেশে। সেখানেও তাদের মানসিক স্বাধীনতা নেই। ফলে তারা পুনরায় বন্দিত্ব স্বীকার করে না। চায় মুক্তভাবে বাঁচতে। যা রাজাসাহেবের পক্ষে বিপজ্জনক। সেজন্য তাদের দেওয়া হয়েছে চিকিৎসকের কাছে—তাদের মাথার মধ্যে যেসব বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনা ঘুরপাক খাচ্ছে তা পরিষ্কার করতে। আগেই বলা হয়েছে রাজাসাহেবের রাজ্যে ক্রমশ জনরোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। নাটকের প্রথম থেকেই দেখা যায় সেই সব ক্ষুব্ধ জনগণ মাঝে মধ্যেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে চলেছে। কখনও-সখনও তাদের দু-একটা আঘাত রাজাসাহেবের শান্তি বিঘ্নিত করছে। তাদের পর্যুদস্ত করতে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকেও অধিক সক্রিয় করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাদের আওয়াজ থামেনি। এই ছেলেটি ও মেয়েটি প্রথম থেকে রাজাসাহেবকে হত্যার প্রয়াস করেছে, কিন্তু একক প্রচেষ্টায়। সেজন্যই বারবার তারা ব্যর্থ হয়েছে। রাজাসাহেব ভালোভাবেই জানে যদি তারা কখনও সেই বিক্ষুব্ধ জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংগঠিতভাবে রাজাসাহেব ও তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে আঘাত করে তাহলে সেই আঘাতকে আটকানোর ক্ষমতা তার নেই। সেজন্যই চিকিৎসককে রাজাসাহেব আদেশ দিয়েছে, ছেলেটি ও মেয়েটিকে বাইরের জনগণ থেকে আলাদা করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজাসাহেবের সেই অভিসন্ধি সফল হয়নি। ছেলেটি অনুভব করতে পারে একা একা যুদ্ধ হয়না। সংঘবদ্ধ আক্রমণই রাজাসাহেবের বর্বর শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার একমাত্র পথ। তাই নাটকের অন্তিমে ধ্বনিত হয়—

‘কোরাস : এ খেলার শেষ—যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।

প্রথম : শেষ লড়াই একটা সত্যই দরকার। আমার শেষ অস্ত্র! ছিন্ন ভিন্ন হোক হাতে-হাতে জড়ানো মানুষের অসংখ্য ঢেউ। অন্ধ হয়ে যাক সুখে-দুঃখে মিলিত অসংখ্য দৃষ্টি। স্তব্ধ হোক

মিলিত পদশব্দের তুমুল গর্জন। আমার শেষ অস্ত্র? ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওদের স্পর্ধার নিষ্ঠুরতম জবাব আমি দিয়ে যাব।

...

ছেলেটি : এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত করো বর্বর স্পর্ধাকে—ইতিহাসের জন্য আঘাত করো।

মেয়েটি : আঘাত করো সিংহাসনের শোষণে—মর্যাদার জন্য আঘাত করো।

দ্বিতীয় : আঘাত করো শৃঙ্খলে—স্বাধীনতার জন্য আঘাত করো।

কোরাস : আঘাত করো জীবনের জন্যে—আঘাত করো—আঘাত করো।'[২৪]

এই নাটকটি যখন মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচনা করছেন তখন তাঁর সামনে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র। নির্বাচনী রাজনীতি জনগনকে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার বিশ্বাস দিতে পারছে না। বারংবার সরকার গঠন আর তার পতন এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে সন্ত্রাস নাটককারকে দ্বিধায় ফেলেছিল। আবার অন্যদিকে নকশাল আন্দোলন, যা প্রথম দিকে কিছুটা আশা জোগালেও পরবর্তীতে সেই রাজনীতিতেও নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। নকশাল রাজনীতিতে সংগঠনকে গুরুত্ব না দেওয়া, শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযান ক্রমশ তাকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই ত্রুটি নাটককারকে ভাবিয়ে তোলে। সেই ভাবনা থেকেই এই নাটকের উৎপত্তি। সেজন্যই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যুদ্ধের সাংগঠনিক গুরুত্বের প্রসঙ্গ দিয়ে।

চলো সাগরে :

বাংলা নাটককারদের মধ্যে যাঁরা গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিল তাঁদের পক্ষে চটজলদি নকশাল আন্দোলন নিয়ে অবস্থান নেওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ নকশাল

আন্দোলন মূলত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লাইনগত অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা সেই সংঘ থেকে বেড়িয়ে এসেছিল তাঁরা সে ক্ষেত্রে নীরব থাকেননি। বিজন ভট্টাচার্যের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। ২৫ মে ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ির হত্যাকাণ্ড ঘটার আগে থেকেই তাঁর নাটকে কৃষক সমস্যার কথা ধরা পড়েছে। 'দেবীগর্জন' নাটকে জোতদারদের শোষণ, কৃষদের অসহায় অবস্থা এবং নিজেদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে জোতদার প্রভঞ্জনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কৃষকদের বিদ্রোহের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে এই নাটকের বিষয়ের সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সুর মিললেও নাটকটি নকশাল আন্দোলনকে সামনে রেখে রচিত হয়নি। নকশাল আন্দোলন নিজের গতি পাওয়ার অনেক আগেই নাটকটি রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। 'গল্প ভারতী' পত্রিকার ১৩৭০ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল[২৫] এবং ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে জাতীয় সংহতি ও শান্তি সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে প্রথম অভিনীত হয়েছিল।[২৬] তবে বিজন ভট্টাচার্য নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকেননি। 'চলো সাগরে' নাটকে তিনি নকশাল আন্দোলনের বাস্তব উপস্থিতি ঘটিয়েছেন।

বিজন ভট্টাচার্য 'চলো সাগরে' নাটকটি রচনা করেছিলেন ১৯৬৮-১৯৬৯ সময়পর্বে। কিন্তু নাটকটি ১৯৭৭ সালের ৩০ মার্চ প্রথম 'কবচকুণ্ডল'-এর প্রযোজনায় তপন থিয়েটারে অভিনীত হয়।[২৭] নাটকটি তবে কেবলমাত্র নকশাল আন্দোলন নিয়েই লেখা নয়। নাটকের 'নান্দীপাঠ'-এ নাটককার লিখেছেন—

> 'মানুষের আছে মিছিল, নদীর আছে সাগর। মিছিলের আছে মানুষ, সাগরের আছে নদী। একটা অনাদ্যন্ত প্রবহমানতা। একই বৃত্তের ঘোলাটে আবর্তের পাপচক্র নয়। জ্বালামুখী ধাবমান কম্বুরেখায়িত এক অলাতচক্র- চৈতন্যের ঘোড়াগুলোর ক্ষুরে ক্ষুরে আগুন ঠিকরোচ্ছে।'[২৮]

এই নাটকে সেরকমই চারটে ঠিকরানো আগুনের কথা বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি নাটক নয়, চারটি ছোট ছোট নাটিকা (নাটককার 'তরঙ্গ' নাম দিয়েছেন)-এর সমাহারে নাটকটি গঠিত। সম্পূর্ণ নাটকটিকে জুড়ে রেখেছে এক মাদারি ও তার ছোকরা। প্রত্যেকটি 'তরঙ্গ'-এ একটি করে মোট চারটি ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। প্রথম তরঙ্গে বর্ণিত হয়েছে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, দ্বিতীয় তরঙ্গে স্থান পেয়েছে ১৯৬৪ সালের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন,

চতুর্থ তরঙ্গে ধরা দিয়েছে শ্রমিক আন্দোলন। আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে কেবলমাত্র তৃতীয় তরঙ্গটি—যার পটভূমি নকশাল আন্দোলন।

নাটকের কাহিনি শুরু হয়েছে তরাই অঞ্চলের এক ডাকবাংলোর ঘরে। যেখানে নকশাল নেতা প্রভাত মজুমদার এবং তার স্ত্রী কালিন্দী থাকে। প্রভাত মজুমদারের নেতৃত্বে জমি দখলের কর্মসূচি চলছে। তাতে সামিল হতে প্রভাতের কাছে এসেছে মাইকেল বিলহন, নরসিং রাজবংশী এবং সোমরা সাঁওতাল ও তার স্ত্রী কালিয়া। মাইকেল সকলের সঙ্গে প্রভাতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। নরসিং চা-বাগানে শ্রমিক আন্দোলন করায় মালিক তাকে কাজ থেকে বার করেছে, তারপর সে জমি চাষ করেছে, কিন্তু গ্রামের জোতদার তার সব জমি কেড়ে নিয়েছে। এই শোষণ থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। সেজন্য সমিতির কথায় প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সোমরা সাঁওতাল আগে বাস করত বাংলা-বিহার বর্ডার এলাকায়। সেখানে চিত্তরঞ্জন কারখানা হওয়ার দরুন অঞ্চলের সমস্ত বাড়ি-ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজেদের ঘর বাঁচাতে তারা বিদ্রোহ করলেও শাসকের সঙ্গে পেরে উঠেনি। অবশেষে এক দালালের হাত ধরে চা-শ্রমিকের কাজ নিয়ে সেখান থেকে তরাই অঞ্চলে চলে আসে। কিন্তু সেখানেও তাকে সহ্য করতে হয়েছে আরেক শোষণ। জীবনের এই সব সংকট তাকে বীতশ্রদ্ধ করে, ফলে সে অনুভব করে বৃহত্তর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। এই সময় নকশাল আন্দোলনের উত্থান ঘটলে সোমরা সেখানে মুক্তির আশা দেখতে পেয়েছিল।

এভাবেই সেই অঞ্চলের জনগণ নকশাল আন্দোলনের পথে সামিল হয়। আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সেই অঞ্চলে পুলিশ, মিলিটারি প্রবেশ করে। সামরিক কর্তার সংলাপে উঠে আসে আন্দোলনের তীব্রতার কথা—

> 'Mark, these are trouble spots: Porabari, Janglebari and Harinbari—শাড়ি ইলাকা সন্ত্রাসবাদীয়োঁকি কব্জেমে হ্যায়। উনলোগ শান্তিবাদী সাধারণ জনতা ঔর জোতদার কি উপর সন্ত্রাসরাজ চালু কিয়া হ্যায়। ইন লুটেরা লোগ জমিন রুপেয়া ঔর গাই-গৌ-সব লুট রহে হ্যায়।'[২৯]

নকশাল আন্দোলনের বিচ্যুতির কথাও নাটকে উঠে আসে। প্রভাতের সভাপতিত্বে আন্দোলন সম্পর্কে যে মিটিং নাটকে আয়োজিত হয়েছে সেখানে বিপ্লবী নং ২-এর মতামত

নিয়ে তীব্র গণ্ডগোল হয়। যেখানে প্রত্যেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিদ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইছে সেখানে বিপ্লবী নং ২ সংগঠনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে—

> 'আপনারা বলছেন—জমির লড়াই রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রাগ্রসর হয়ে গুণগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে একটা বৈপ্লবিক অবস্থা তৈরি করেছে।...এই বৈপ্লবিক চেতনা যেটা লাগাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর থেকে অনেক আয়াসে বহুদিন ধরে আয়ত্ব করতে হয়—পোড়াবাড়ি, জঙ্গলবাড়ির এই সহজ সরল আদিবাসীরা সেই চৈতন্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছে, একথা আমি অন্তত স্বীকার করি না। এতে আমার মনে হয়—দেশের বড় বড় জোতদার ও ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদের এই ন্যায্য জমির লড়াইকে বানচাল করার সুযোগ পাবে। তথা কথিত সন্ত্রাসবাদী অতিবিপ্লবী কার্যকলাপের নজির দেখিয়ে জমির চাষীর ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করবে।'[৩০]

কিন্তু বিপ্লবী নং ২-এর কথা মিটিং-এ গৃহীত হয় না এবং আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী অতিবিপ্লবী পন্থা অবলম্বন করে। বিপ্লবীরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গলে ঘাঁটি তৈরি করে সেখান থেকে বিপ্লব পরিচালনা করে। জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জঙ্গল ঘিরে ফেললে যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে গ্রামে পুলিশ ও সেনারা ঢুকলে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করার বদলে সমস্ত পুরুষ জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এখানেই প্রভাত সংগঠনের গুরুত্ব ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই তরঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটেছে কানিন্দীর মৃত্যু দিয়ে। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হতে গিয়েই সে সেনার হাতে খুন হয়।

কলকাতার হ্যামলেট :

একদিকে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং অন্যদিকে তা দমনে রাষ্ট্রের ভূমিকা—এই পটভূমিকে কেন্দ্র করে অসিত বসু রচনা করেন 'কলকাতার হ্যামলেট'। লিটিল থিয়েটার

গ্রুপ থেকে বেরিয়ে এসে অসিত বসু প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ১৬ আগস্ট ১৯৭৩ সালে কলামন্দিরে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৭১ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন মিত্র অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হন।[৩১] এই ঘটনা নিয়ে সে সময়ের বাংলার সংস্কৃতি মহল সেরকম উচ্চবাচ্য না করলেও অসিত বসু তাঁর এই নাটকে সেই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন। পাশাপাশি সে সময়ের কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নাটকে স্থান দিলেন। নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি উৎপল দত্তর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধগ্রন্থের 'ধর্মতলার হ্যামলেট' প্রবন্ধের নামের অনুসরণ করেছেন।[৩২] নাটকটির পরিকল্পনা সম্পর্কে নাটককার বলেছেন—

> 'সত্যেন মিত্রর মৃত্যু আমাকে খুব বেশি নাড়া দিয়ে গেল। একজন থিয়েটার কর্মী গুলি খেয়ে রাজপথে পড়ে আছে। এইবার যদি লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করে তবে কেমন হয়? লোকটা কেন মরল? সে যদি মরতে না চায়? এই হচ্ছে বীজ—আমার কলকাতার হ্যামলেটের।'[৩৩]

'কলকাতার হ্যামলেট' নাটকটি শুরু হয়েছে ফটোগ্রাফার শম্ভু সেনের কথা দিয়ে। সে একাধারে নাটকের একজন চরিত্র এবং সূত্রধার। নাটকের পটভূমি সাতের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতায় পরিপূর্ণ কলকাতা, সেকথা আগেই বলেছি। সেই কলকাতার চিত্র বর্ণনা করে শম্ভু নাটকের সংকট দর্শক ও পাঠকদের ধরিয়ে দিয়েছে একেবারে প্রথমেই।–

> 'কলকাতা... কলকাতা...বহু বিতর্কিত কলকাতা মহানগরী অথবা মৃতনগরী বা মিছিলনগরী... কলকাতা... মহান মৃত মিছিল নগরী। এখানে পথে মৃত শব রেখে নির্বিকার চিত্তে ঘরে চলে উৎসব। এখানে পথেতে ঘাম, রক্ত বুলেট, লাঠি ও বোমা। তারই পাশে আছে সর্বজনীন পূজার মাইক, চাঁদা, জলসা, সিনেমা, সংস্কৃতির ধামাকা। এখানেতে ক্ষুধা, অনাহার আর মহামারি, ঐশ্বর্যের প্রভুদের বেলেল্লাপনা, বাড়াবাড়ি। একই বুকে সব ধরে, সব সয়ে আছে কলকাতা – আমার শহর কাতরায় নাকো, বোঝে না সে আর কোনও ব্যথা আজব-আজব। আমার আজব শহর কলকাতা'।[৩৪]

এরপর মূল নাটক শুরু হয়েছে মধ্যরাতের অন্ধকারে। মাঝে মাঝে পুলিশভ্যান ও মিলিটারি টহল দিচ্ছে, তারই মাঝে দুজন মাতাল মাথার ওপরে হাত তুলে কলকাতার পথে হাঁটতে

হাঁটতে হঠাৎ এক মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সেই মৃত দেহের সৎকার করতে প্রথম মাতাল সাহায্য আনতে যায়, আর এম. এ. পাশ মাস্টার অর্থাৎ দ্বিতীয় মাতাল মৃতদেহটিকে পাহারা দেয়। তখন হঠাৎ সেই মৃতদেহ জেগে উঠে তাকে তার মৃত্যুর গল্প বলে—এখানেই নাটক প্রবেশ করে তার মূল আখ্যানে। এই মৃত ব্যক্তির নাম অভি রায়।

অভি একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব। পলিটিক্যাল থিয়েটারেই তার আস্থা। ফাল্গুনি, রাধা, বাসব, তপন, অনন্ত, শ্যাম তার দলের নাট্যকর্মী। অভির নির্দেশনায় তারা সবাই 'সাতরথী' নাটকের মহলা দিচ্ছে। নাটকের বিষয় অভিমুন্য চক্রব্যূহে দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ সপ্তরথী দ্বারা আক্রান্ত। বর্তমানের অস্থিরময় পরিস্থিতিতে এরকম পৌরাণিক নাটকের প্রয়োজনীয়তা কী—সেই নিয়ে অভির সঙ্গে তার দলের বাকি নাট্যকর্মীদের তর্ক। আবার শ্যাম মহলায় অনেক দেরি করে আসে। শ্যাম কারখানার শ্রমিক। তার দেরি করে আসার কারণ হিসেবে সে জানায় তাদের পাড়ায় পুলিশ ও মিলিটারি মিলে 'এক্সট্রিমিস্ট' অর্থাৎ নকশালদের ধরতে 'কোম্বিং' করেছে। সাতের দশকের কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের এটা একটা বাস্তব চিত্র। নকশালদের ধরতে গিয়ে পুলিশ, মিলিটারি সাধারণ মানুষের উপরই অত্যাচার করত বেশি। নাটকে শ্যামের কথাতেও সেই প্রসঙ্গই উঠে আসে। এখানেও দেখা যায় 'এক্সট্রিমিস্ট' ধরতে গিয়ে শ্যামের পাশের বাড়ির চৌধুরী মশায়ের ছেলেকে গ্রেপ্তার করে—যার একটা পা নেই। আর ৭১ বছরের দত্ত মশাই এর কারণ জানতে চাইলে তাকে প্রহার করতেও পুলিশ পিছপা হয়নি। এইসব কথাবার্তার মাঝেই হঠাৎ একটি ছেলে পুলিশের তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য সেখানে আসে। এই ছেলেটি নকশাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তার অপরাধ দেশের বর্তমান 'সিস্টেম'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। অভিও প্রতি বছর নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি শাসন দেখে দেখে আর গণতন্ত্রের প্রতি ভরসা রাখতে পারে না। পুলিশ অফিসার পাকড়াশি হাবিলদার সখীচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে আসার আগেই অভির নির্দেশে রাধা ছেলেটিকে লুকিয়ে ফেলে। ফলে তল্লাশি করেও তাকে পুলিশ হাতে পায় না। অবশেষে পাকড়াশি সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগে অভিকে হুমকির সুরে বলেন যে, তার নামও পুলিশের 'সাসপেক্ট লিস্ট'-এ আছে। কেননা তার নাটকগুলিতে ধ্বনিত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শাসকের পচ্ছন্দ নয়। এখানেই শ্যাম ১৮৭৬-এর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের প্রসঙ্গ তুলে বুঝিয়ে দেয়, শাসক বদলালেও তার শাসনের চরিত্র বদলায় না। পুলিশ চলে গেলে ছেলেটির সঙ্গে তাদের কথোপকথন হয়। নাটকটি

যে সময় লেখা হচ্ছে তখন নকশাল আন্দোলন প্রায় পতনের দিকে, নকশালপন্থীদের শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযান, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' ইত্যাদি রাজনৈতিক লাইনের জন্য সে সময়ের সাধারণ মানুষের থেকে তারা অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য বুদ্ধিজীবীরা কলম ধরলেও নকশাল আন্দোলনে শামিল ছাত্র-যুব-কৃষক-শ্রমিকদের পাশে তেমন কেও নেই। এই অভিযোগ মহাশ্বেতা দেবীও তাঁর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে করেছেন। এখানেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এর একটা কারণ অবশ্য নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে চলার অভ্যাস। নাটকে ছেলেটি এই অভ্যাসকে 'intellectual masturbation' বলে আক্রমণ করেছে। ছেলেটি মেধাবী ছাত্র, হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন প্রাপ্ত। কিন্তু আজ পুলিশের চোখে সে একজন 'অত্যন্ত dangerous অ্যান্টিসোশাল এলিমেন্ট!' তার বারো বছর বয়েসে বাবা মারা গেছে। বর্তমানে তার ভাইয়ের চাকরি গেছে কেবলমাত্র একজন নকশালের ভাই হওয়ার দরুন। এখানেই কলকাতা যেন ডেনমার্কের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। নাটককার তাঁর 'আমাদের হ্যামলেট—আমাদের কলকাতা'-তে বলেছেন—

> 'কলকাতা ক্লডিয়াসের ডেনমার্ক নয়—তবু মাঝে মাঝে মনে হয় ক্লডিয়াসের ডেনমার্কটা বোধ হয় আমাদের কলকাতার মতোই ছিল অনেকটা। সেখানে হ্যামলেট লেয়ার্টেসের মতন ছেলেরা ক্লডিয়াসের দাবার চালে নিজেদের মধ্যে লড়ে মরে।'[৩৫]

নাটকেও কথোপকথনে উঠে আসে সেই কথা—

'শ্যাম : কনসিডার আস অ্যাজ দি বেলেডিয়ার্স অফ ইয়োর প্যাশন! আমার এক খুড়তুতো ভাই...মরেছে! ৩৮ কেলিবারের গুলিতে। বারাসাতে আরও সাতজনের লাসের সঙ্গে পাওয়া যায়—হাত পিছনে বান্ধা—ঘাড়ের কাছে গুলি! ৩৮ কেলিবার। খুনিগো পাত্তা নাই।

অভি : দেশটা কসাইখানা হয়ে গেল! Its stinking, we are living in a prison–একটা বিরাট জেলখানা! প্রতিবাদের অধিকার পর্যন্ত নেই।

অনন্ত : এ যে সেই হ্যামলেটের দশা : Denmark is a prison!

ফাল্গুনী : এ দেশটা তো ক্লডিয়াসের ডেনমার্ক নয়।

ছেলেটি : Claudius-রা সব দেশকালেই ছড়িয়ে আছে। বেচারা লেয়ার্টেস আর হ্যামলেটরা মরছে নিজেদের মধ্যে লড়ে। জানেও না, ওদের অস্ত্রের ধারের আড়ালে ক্লডিয়াসের দেওয়া বিষ মাখানো।'[৩৬]

এখানেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে অভির 'সাতরথী' নাটক। এরাই আজকের যুগের অভিমুন্য। দেশময় কুরুক্ষেত্রের পরিবেশ আর অভিমুন্যরা চক্রব্যূহে আবদ্ধ। এরপর ছেলেটি সেখান থেকে প্রস্থান করলে কিছুক্ষণ পরেই বাইরে বন্দুকের গুলি চলে। শেষে খবর আসে ছেলেটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। যাওয়ার সময় রাধা তাকে একটি সাদা গোলাপ দিয়েছিল—যেটি তার রক্তে লাল হয়ে গেছে।

এই সমস্ত ঘটনা অভির মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সব কিছু দেখে আর সে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তার কাছে কলকাতা হয়ে উঠে ক্লডিয়াসের ডেনমার্ক। 'ইলিউশন'-এ অভি হ্যামলেটকে দেখে। শেকসপিয়ারের হ্যামলেটকে যুবরাজ হিসেবে দেখেননি নাটককার, দেখেছেন দ্বিধা, সংশয়, স্ববিরোধী যুক্তির জালে আবদ্ধ একজন 'টিপিক্যাল' মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে। আর সেজন্যই নাটককার অভি রায়ের মানসদ্বন্দ্বকে হ্যামলেটের মানসদ্বন্দ্বের সঙ্গে একসূত্রে মেলাতে পেরেছেন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নাটককার নিজেই বলেছেন—

> 'আমার নাটকের protagonist হচ্ছে একজন মধ্যবিত্ত intellectual personality—অভি এবং সে Theatre personality। আমাদের দেশের এই ধরণের মানুষদের মধ্যে শেক্সপিয়র এবং হ্যামলেট-এর একটা obsession থাকে। তারা এক হিসেবে হ্যামলেট-ই। হ্যামলেটের মধ্যে to be or not to be-র যে দোলাচল চলে, সেটা এঁদের মধ্যেও সবসময় দেখা যায়। সেই জায়গা থেকে অভির alter ego হয়ে হ্যামলেট ওখানে আসে।'[৩৭]

এই হ্যামলেট আসলে অভির মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকা হ্যামলেট। যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ে জর্জরিত। ছেলেটির হত্যা এবং তৎকালীন অস্থির পরিবেশের প্রতিবাদ করেছে অভি তার 'সাতরথী' নাটকে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ রূপে অবিচল থাকতে পারছে না। তার মনের 'alter ego' অর্থাৎ হ্যামলেট এক্ষেত্রে কিছুটা ভয় পায় ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা ভেবে, কারণ অভির এই কাজে প্রশাসন চুপ করে থাকবে না এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভি শেষপর্যন্ত মানসদ্বন্দ্বে উত্তরণ লাভ করতে সক্ষম হয়। সেজন্যই বিবেকের তাড়নায় যে হ্যামলেট ক্লডিয়াসের কাছে প্রতিশোধ নিতে পারেনি, সেই হ্যামলেটকে প্রশ্ন করেছে—

> 'তোমার বাবাকে খুন করেছে, মাকে ভোগ করেছে, তোমার দেশটাকে ভোগ করেছে—আমূল ছোরাটা ওই Claudius-এর বুকে বিঁধিয়ে দিতে পারনি?'[৩৮]

সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সর্বযুগে অভিমুন্য, হ্যামলেট, ছেলেটা বা অভি রায়ের মতো ব্যক্তিরা বারবার এসেছে। তারা দুর্গম রাস্তায় পাড়ি দিয়েছে। সমাজ প্রতিনিয়ত তাদের পাশ থেকে সরে গেছে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মর্মের মাহাত্ম্য ঠিকই টের পেয়েছে। জনগণের বিচারে এই প্রতিবাদী সত্তাদের রাষ্ট্র বারবার স্তব্ধ করতে তৎপর হয়েছে। শারীরিক নির্যাতন, হত্যার সঙ্গে সঙ্গে আইনি ভয় দেখানো রাষ্ট্রের অন্যতম অস্ত্র থেকেছে। নাটকেও অনুরূপ ধারা ধরা পড়ে আদালতের দৃশ্যে। অভির সেখানে বিচার হচ্ছে। কারণ সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে; তাকে চুপ করানো আবশ্যক। এ যেন এক দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রহসন। অভির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং স্মাগলিং-এর মতো মিথ্যা মামলা আনা হয়। আর সাক্ষী হিসেবে সাজানো হয় অভির নাট্যদল যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মহলা দিত সেই বাড়ির মালিক লালমোহন মল্লিক, সাহিত্যিক সুবোধ মুখোপাধ্যাকে। তবে তাদের মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কথা প্রমাণ হলে মামলাগুলি খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু সাক্ষী হিসেবে শংকর গুপ্ত এসে হাজির হলে গোলমাল বাঁধে। এই ব্যক্তি অভির নাট্যগুরু। এই ঘটনা অভিকে আঘাত করে। তার 'alter ego' হ্যামলেট তাই বলে উঠে—

> 'There are more thing in heaven and earth
>
> Horatio, than dreamt of in your philosophy.'[৩৯]

সেজন্যই অভি আদালতের আর সমাজের এই বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর ব্যক্তিদের যন্ত্রণায় হতাশার সঙ্গে বলে—

> 'এরা দানব; এরা সব পারে। শ্মশানচারী শংকরকে এরা বাদশার হারেমে নিয়ে গেছে! পিনাকপাণির ত্রিশূল, জটাজুট খুলে বৃহন্নলার বেশ দিয়েছে! আমার নটরাজের পায়ে এরা বাইজির ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছে! canst thou not minister to a mind diseased, and pluck from memory a rooted sorrow! এ মামলা আর কন্টিনিউ করবেন না, please! আমার সব অপরাধ আমি স্বীকার করছি! হ্যাঁ, আমি খুনের ষড়যন্ত্র করেছি। একটা পচাগলা হেজে যাওয়া System-কে আমি খুন করেতে চেয়েছি। আমার বিশ্বাসঘাতক পূর্বপুরুষদের আমি খুন করতে চাই। আমি স্মাগলিং করেছি। আমার দেশের প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কের বন্দরে বন্দরে আমার idea আর স্বপ্নগুলো স্মাগল করতে চেয়েছি, but I have failed! আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে, আমি ব্যর্থ – আমায় চরম শাস্তি দিন; ভেঙে ফেল —খুন কর এই বিশ্বাসঘাতকদের। আমাদের রক্ত এরা কলুষিত করেছে।'[৪০]

কিন্তু অভির বিচার হয়না এই আদালতে, বিচার হয় হুঁকোদের মতো সরকারের পোষা গুন্ডাদের আদালতে। এর মধ্যে অভির নাট্যদলকে কলকাতার সমস্ত থিয়েটার বয়কট করেছে; ফাল্গুনী দল ছেড়ে দিচ্ছে, তপন প্রতিবাদী থিয়েটার করতে চাইছে না, রাধাও সাবধানে চলার কথা বলছে। পাশে থেকেছে কারখানার শ্রমিক শ্যাম এবং কিশোর অনন্ত। মহলাকক্ষ থেকেও সে বিতাড়িত। তাও সে থামেনি। শেষপর্যন্ত তাকে খুন করে থামানো হয়েছে। কিন্তু এখানেই অভিদের মতো প্রতিবাদী সত্তাদের মৃত্যু হয় না। দৈহিক মৃত্যু হলেও তাদের 'আইডিয়া'-র মৃত্যু ঘটে না। তাই নাটকের শেষে অভি বাঁচতে চেয়েছে।–

> '... না আমি মরব না। আমার থিয়েটার.... আমার কবিতা.... আমার মানুষরা বিকিয়ে যাচ্ছে! আমি মরব না। ... পুরোনো একটা system-এর ভূত আমার দেশটাকে গলা টিপে মারছে...! ভাড়াটে গুন্ডার হাতে আমার

ভাইরা মরছে!.... আমি মরব না!....I refuse to die! ... আমায় এরা বারবার খুন করেছে —ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, বলিভিয়ার, কঙ্গোয়, ভিয়েতনামে, ঢাকায়, কলকাতায়.... আমি আর মরব না'।[৪১]

অমল রায় :

নকশালবাড়ি রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সব থেকে বেশি নাটক যাঁর নামে পাওয়া যায় তিনি অমল রায় (১৯৫০-২০১১)। তাঁর আসল নাম তপনকুমার দাস, কিন্তু নাট্যজগতে অমল রায় নামে খ্যাত। তাঁর বাবা ব্রজেন্দ্রনাথ দাস একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতাজীর অনুগামী ছিলেন। পিতার সংগ্রামী আদর্শের উত্তরাধিকার অমল রায়ও বহন করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যে সময় তিনি প্রেসিডেন্সির ছাত্র সে সময় ছাত্র-আন্দোলনের একটা অগ্নিময় যুগ। বামপন্থী আদর্শকে সমর্থন করতেন, কিন্তু সি. পি. আই (এম)-এর সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরোধিতাও করতেন। পরবর্তীতে নকশালবাড়ি আন্দোলন সংঘটিত হলে তার মধ্যে নিজের ঈপ্সিতকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে আজীবন তিনি নকশাল আদর্শ ও আন্দোলনকে সমর্থন করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার নাট্যকার জীবনের শুরুই হয়েছিল নকশালবাড়ির রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে।'[৪২] ফলে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে নকশালদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্মে অংশ নিয়েছেন, সেজন্য তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়েছে বারবার। তিনি চাকরি খুইয়েছেন, জেলে গেছেন। তাতেও আদর্শচ্যুত হননি। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর নাটক যেন গর্জে উঠেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার আপোসহীন শিল্পী। দিলীপকুমার মিত্র তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষই তো তাঁর আরাধ্য, মানুষকে ভালোবেসেই তিনি পাবেন তাঁর ঈপ্সিতকে, যা হল সর্বহারার অধিকার স্থাপন। এই আদর্শ তাঁকে সারাজীবন তাড়িত করেছে।'[৪৩] সেই সুর আমরা পাব তাঁর রচিত নাটকে। অমল রায়ের নামে চারশোর অধিক নাটক পাওয়া যায়। তার বেশির ভাগটার মধ্যেই আছে নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রতিফলন। এখানে নির্বাচিত কিছু নাটকের আলোচনার মধ্য দিয়ে নকশালবাড়ি রাজনীতি নিয়ে তাঁর অবস্থান চিনে নেব এবং দেখে নেব নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে তাঁর নাটকের গুরুত্ব।

দালাল :

অমল রায়ের প্রথম মুদ্রিত নাটক 'দালাল'। নাটকটি যখন তিনি রচনা করেন তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি উত্তাল সময়। একদিকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী থাবা পড়েছে ভিয়েতনামের উপর। মার্কিন সেনার অত্যাচারে দীর্ণ হয়েছে ভিয়েতনামের জনজীবন। আর অন্যদিকে সেসময় দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নকশালবাদী বিপ্লবী যুবকদের চলছে সংগ্রাম—তারা 'সত্তর দশককে মুক্তির দশক'-এ পরিণতি করতে উদগ্রীব। তাদের সেই সংগ্রাম দমন করতে সশস্ত্র হয়ে নেমেছে পুলিশ। চারিদিকে চলছে একটি সন্ত্রাসের হাওয়া। পথে-ঘাটে-জেলে মারা যাচ্ছে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়। একই সময়ের দুটি ভিন্ন দেশের দুটি ভিন্ন মুক্তির লড়াইয়ের দুটি সাবপ্লট নিয়ে 'দালাল' নাটকটি রচিত। নকশাল যুবকদের বিপ্লবী সংগ্রাম এবং ভিয়েতনামের যুবকদের মুক্তির সংগ্রাম যেন এক জায়গায় এসে মিশেছে নাটকটিতে। কাহিনি বিশ্লেষণ করে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

নাটকটি শুরু হয়েছে ভিয়েতনামের একখণ্ড দৃশ্য দিয়ে। যেখানে একজন ভিয়েতনামী বুড়িকে দুটি মার্কিন সৈনিক জিজ্ঞাসাবাদের নামে কেবল অত্যাচার করছে। বুড়িটি আসলে ভিয়েতনামের একজন কমিউনিস্ট গেরিলা যোদ্ধা ন্‌গুয়েন বিন-এর মা। মার্কিন সেনা আছে তার সন্ধানে। তাদের কাছে খবর আছে ন্‌গুয়েন বিন গত রাত্রে তার মার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু মা ছেলের সন্ধান তাদের দেয় না। সেজন্য উত্যক্ত মার্কিন সৈনিক তাকে হত্যা করে।

এর পরেই আসে কলকাতার দৃশ্য। যুবক শান্তিপ্রিয় তার প্রেমিকা রমার অপেক্ষায় কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে—যে সব সময় বলে সে কোনও রাজনীতি করে না, সে দুশো তিরিশ টাকা মাইনের একজন কেরাণী। তার উপর পুরো সংসারের বোঝা। বাইরের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। কিন্তু রাজনীতির পরিসর থেকে কোনও মানুষ নিজেকে আলাদা রাখতে পারে না, স্বৈরাচারের বিষ বাষ্প সবাইকে স্পর্শ করে। প্রতিবাদহীন শান্তিপ্রিয়ও তার ব্যাতিক্রম নয়—তাই দেখি তার দাদা চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে, তার ভাই রজতকে নকশাল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার দরুন পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে কেন্দ্র করে এবং তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ঘটনার

সমাবেশে নাটকের গঠনের অগ্রগতি হয়েছে। সেই সঙ্গেই নাটকে উঠে এসেছে সেই সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা।

ভিয়েতনামে যেমন আমেরিকার সেনা অত্যাচার করছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সরকার ও প্রশাসনও বিপ্লবী নকশাল ছাত্র-যুবদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে সাতের দশক জুড়ে। বাংলার মানুষ আমেরিকার স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করে, কিন্তু নিজের দেশের শাসকের একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তারা নীরব। তাই শান্তিপ্রিয় নির্যাতিতা ভিয়েতনামী মায়ের মধ্যে দেশের নকশাল যুবকদের মাকে খুঁজে পায়। রমার জন্য অপেক্ষা করছে শান্তিপ্রিয় এরকম সময়ে হরিনাথ প্রবেশ করে। তাদের কথোপকথনে উঠে আসে—প্রথমত, হরিনাথ যে অফিসে কাজ করত সেটি একমাস পর ব্যাঙ্গালোরে বদলি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং একমাস পর সে কর্মহীন। দ্বিতীয়ত, হরিনাথের ছেলে অসীম, যে শান্তিপ্রিয়র ভাই রজতের বন্ধু, তাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে বাগমারীতে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। সে বিষয়ে কোনও তদন্ত হয়নি। তৃতীয়ত, এই সময় জেলের মধ্যে নকশাল কর্মীদের হত্যা করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; সেরকমই বহরমপুর জেলে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং সরকারি হিসেবে ষোল জন মারা গেছে।

হরিনাথের প্রস্থানের পর প্রবেশ করে সুপ্রিয়। সুপ্রিয় যে কারখানায় কাজ করত সেটি লকআউট হয়ে যাওয়ায় সে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছে। তার সঙ্গে কথা বলে শান্তিপ্রিয় জানতে পারে রমা যে পাড়ায় থাকে সেখানে পুলিশ প্রবেশ করেছে এবং নকশাল সন্দেহে তিনটি ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। সুপ্রিয়কে যখন শান্তিপ্রিয় নির্যাতিতা ভিয়েতনামি মায়ের ছবি দেখিয়ে বলে তার কেমন চেনা চেনা লাগছে, তখন সুপ্রিয় তাকে উত্তর দেয়—

> '...চেনা চেনা তো লাগবেই। আমার মা তোর মা—সবার মা'রই তো এক অবস্থা।'[৪৪]

তখন শান্তিপ্রিয়র সামনে ভেসে ওঠে তার মায়ের সন্ত্রস্ত রক্তাক্ত মুখ। রজতের সন্ধানে পুলিশ তাদের বাড়িতে এসে তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রজতের সন্ধান দিতে তার মা অস্বীকার করলে পুলিশ অকথ্য ভাষায় গালি দেয় এবং শারীরিক নির্যাতন করে। তা

সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় কোনও প্রতিবাদ করেনি। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে সে সব কিছু সহ্য করেছে তার মধ্যবিত্ত ছাপোষা ভীতু মানসিকতার কারণে। তাই সে অতি কষ্টের সঙ্গে বলে ওঠে—

> '...আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটে যাচ্ছে কে যেন অবিরাম, আর ওদিকে অচৈতন্য মা, জানালা দিয়ে আমি তো সব দেখছি—রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘর, সারা দেশ, মা'র মুখ অবিকল ঐ ছবির মত, ঐ রক্তাক্ত সন্ত্রস্ত ভিয়েৎনামী বৃদ্ধা, ভিয়েৎনামের নির্যাতিতা মা, আর আমার মা আমি আমি...ভীষণ ভয়, ভীষণ ভয়...আমি রাজনীতি করি না, আমি বেঁচে থাকতে চাই—তাই আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে—আর আমি নিশ্চুপ নির্বাক।'[৪৫]

ঘটনার গতি পরিণতির দিকে এগোয়। রমা সেখানে এসে পৌঁছায়। কিন্তু সেখানে আসার আগে রমা রজতের বন্ধু বিজনের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। সেজন্য পুলিশের কু-নজরে পড়েছে সে। পুলিশ তাকে জোর করে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের খপ্পরে পড়ার আগেই রমা শান্তিপ্রিয়কে সরিয়ে দিয়েছিল, ফলে সে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু তার গা-বাঁচানো মনোভাবের জন্য সেখানেও সে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারেনি। রমাকেও সে বাঁচাতে পারেনি। এমন কি পুলিশ তার নাম জানতে চাইলে সে অন্য নাম বলে নিজেকে গোপন করে। তারপরেই ছোট্ট একটা দৃশ্যে দেখা যায় রমার কাছ থেকে বিজন, প্রকাশ, অশোকের মতো নকশাল যুবকদের সন্ধান বার করতে তার উপর পুলিশ শারীরিক নির্যাতন করে। নাটকের অন্তিমে শান্তিপ্রিয় ভিয়েতনামের নির্যাতিতা মায়ের চিত্রর পাশে দেখে আরও দুটি চিত্র—ভিয়েতনামের ধর্ষিতা রমণী এবং রাইফেল হাতে বলিষ্ঠ যুবক। রমা সেই রমণীর মতো হতে পেরেছে, কিন্তু শান্তিপ্রিয় রাইফেল ধারণ করতে পারেনি। সেজন্য তার অন্তর ক্ষোভের আগুনে দগ্ধ হয়েছে।

নাটককার নাটকটির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে যদি কেউ ভাবে সে নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখে সুরক্ষিত রাখতে পারবে তাহলে সেটা তার ভ্রান্ত ধারণা। রাজনীতির আগুন তাকেও পোড়াবে। সেজন্যই নাটকে দেখি, শান্তিপ্রিয়

নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলেও রাজনীতির কালো ছায়া তার মা, ভাই, প্রেমিকা সবার উপরেই পড়েছে। সুতরাং প্রতিকুল পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে নয়, লড়াই করে টিকে থাকার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন নাটককার।

দুই চোরের গপ্পো :

জেলের ভিতরের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে অমল রায় লেখেন 'দুই চোরের গপ্পো'। নাটককার জানিয়েছেন এই নাটকটির গল্প বিজন ভট্টাচার্য মৃণাল সেনকে বলেছিলেন এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিজন ভট্টাচার্য সেটি লিখে যেতে পারেননি। সেজন্যই অমল রায় একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছেন সেই কাহিনির নাট্যরূপ দেওয়ার।[৪৬]

হাবিলদার শিউনারায়ণের দুজন চোর মকবুল ও গণেশকে মারতে মারতে জেলের মধ্যে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে নাটকটির শুরু। সেখানে একজন নকশাল যুবক তাদেরকে শিউনারায়ণের মারের হাত থেকে রক্ষা করে। এরপর দুই চোর নকশাল যুবকের রাজনৈতিক জীবনের কথা শুনে তার ভক্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং চোর দুজনকে যুবক নিজের ওয়ার্ডে নিয়ে এসে নকশাল রাজনীতির শিক্ষা দেয়। তারাও ক্রমে নকশাল রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

মূল কাহিনিতে যাওয়ার পূর্বে সূত্রধার নাটকের মূল সুরটি দর্শকদের চিনিয়ে দিয়েছে গানের মধ্য দিয়ে—

'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ো ধরা।
ধরা পড়লেই তোমার হাতে উঠবে রে হাত কড়া।।
এই দুনিয়ায় ছিঁচকে চোরেরাই ধরা পড়ে, জেল খাটে।
কিন্তু বড়দরের ওস্তাদেরা বুক ফুলিয়ে পথ হাঁটে।।
যারা চাষির জমি চুরি ক'রে হাজার হাজার টাকা জমায়।
তারাই বনে গ্রামের মাথা, মন্ত্রী-এমেলে তারাই বানায়।।

শ্রমিকের মজুরি চুরি ক'রে যারা হয়েছে পুঁজিপতি।

তারাই হলো সর্বেসর্বা—আমাদের দুর্গতি।।

বড়জাতের চোর-জোচ্চোর হয় যে দেশের নেতা।

জেলে কিন্তু যায় না তারা—মুখে বড় বড় কথা।।

কিন্তু যারা পেটের দায়ে ঘটি বাটি চুরি করে খালি।

মার খেতে খেতে জেলে ঢোকে, খায় যে গালাগালি।।

আমাদের দুই ছিঁচকে চোরেরও নসীবে ঘটেছে তাই।

বামাল সমেত ধরা প'ড়ে শ্বশুরবাড়িতে যায় জামাই।।

কিন্তু জেলে এসেই তাদের জীবনে ঘটলো যে ভাই অঘটন।

আশ্চর্য এক গুরুর দেখা পেয়ে গেল ভক্তগণ।।

তাই গুরুর সঙ্গে চেলারা ভাই ওঠে বসে সবসময়।

আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে তাদের দুনিয়া পালটে যায়।।'[৪৭]

সূত্রধারের এই বক্তব্যই নাট্যরূপ পেয়েছে এখানে।

নাটকের কাহিনিতে দেখি দুটি চোর মকবুল ও গণেশ প্রথম থেকে চুরি করত না। তারা প্রথম জীবনে ছিল যথাক্রমে কৃষক ও কারখানার শ্রমিক। মকবুল যে গ্রামে বাস করত সেখানকার জোতদার বিষ্টু ঘোষ মকবুলের সব জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখিরি বানিয়েছিল। পেটের জ্বালায় তখন বাধ্য হয়ে সে চুরি করতে শুরু করে। প্রথমবার চুরি করতে গিয়েই সে ধরা পড়ে—জেল হয়। ছাড়া পাওয়ার পর ঘরে এসে দেখে তার সন্তান না খেতে পেয়ে মারা গেছে এবং স্ত্রী পালিয়ে গেছে। সেজন্যই নকশাল যুবকটি যখন জোতদার সনাতন পালের ঘরে তার প্রথম ডাকাতির কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলে—

'...সনাতন পাল আস্ত শকুন! কত লোকের যে ও সর্বনাশ করেছে, মিথ্যে দেনার দায়ে কত জনের যে জমিজায়গা কেড়ে নিয়েছে, কত মা-বোনের

ইজ্জত নিয়েছে তার ঠিক নেই। গাঁয়ের চাষিদের ওপর কত অত্যাচারই না করেছে—ভয়ে কেও টুঁ শব্দটি করতে পারতো না। যে ওর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে তাকেই সনাতন পাল গলা কেটে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে—এত বড় বদমাইস—থানা-পুলিশ পর্যন্ত ওর হাতে-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট সব ওর ট্যাঁকে গোঁজা—এত দাপট ছিল তার—'।[৪৮]

তখন মকবুলের শ্রেণিশত্রুকে চিনে নিতে ভুল হয়নি। আবার অন্য একদিন যখন যুবকটি বলে, 'কলকারখানার মালিক যারা, তাদের টাকা হলো কী ক'রে—শ্রমিকদের পাওনা টাকা মেরে দিয়ে'[৪৯], তখন গণেশ চিনেছে তার শত্রুকে। যার জন্য সে শ্রমিক থেকে চোর হয়েছে। তাই সে বলে—

'... বছর পাঁচেক আগে আমিও তো এক কারখানায় কাজ করতাম, দিনরাত খাটতাম, তবু শালা হপ্তার শেষে হাতে রেশন তোলার টাকা থাকতো না। আর মালিক গাড়ি চড়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো, একটা কারখানা থেকে তিনটে কারখানা করলো, তবু শালা আমাদের একটা পয়সা মজুরী বাড়াতো না। শেষকালে বাধ্য হয়ে আমরা ইস্টেরাইক করলাম। মালিক শালা দিলো কারখানা বন্ধ ক'রে। তখন আর কোথায় যাই? কোথাও কাজ নাই, সবাই বেকার। কী আর করবো গুরু—কপাল ঠুকে লাইনে নেমে পড়লাম।'[৫০]

নকশাল আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে জনগণের মনে তাদের প্রতি ঘৃণা তৈরি করা এবং তারপর শ্রেণিশত্রু খতমের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই নাটকটিতেও আমরা সেই বিষয়কে গুরুত্ব পেতে দেখি। সাধারণ চুরির দায়ে মকবুল ও গণেশের জেল হয় তিন মাসের। জেলে এসে যে নকশাল যুবকটির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় তাকে তারা মাস্টারমশাই সম্বোধন করে। মাস্টারের মতোই সেই যুবক তাদের নকশাল রাজনীতির শিক্ষা দেয়, শ্রেণিশত্রু চিনিয়ে দেয় এবং তাদের খতম না করলে তাদের অবস্থার যে কোনও উন্নতি হবে না তা বুঝিয়ে দেয়। তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় কীভাবে মহাজনরা, পুঁজিপতিরা তাদের শোষণ করে টাকার পাহাড় তৈরি করে এবং

কেন তারা সারাদিন পরিশ্রম করেও নিজেদের জীবন সাধারণভাবেও চালাতে পারে না। এই শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাস্টার দুই চোরকে বলে সারা দেশজুড়ে বৃহত্তর ডাকাতদল তৈরি করার কথা অর্থাৎ নকশাল সংগঠন তৈরির কথা। যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শোষকের ঘরে ডাকাতি করে লুণ্ঠিত সম্পত্তি গরিব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আর সেই ডাকাতি কোনও অন্যায় নয়, কোনও গর্হিত কাজ নয়। কারণ তারা গরিবদের শ্রম, সম্পত্তি, প্রাপ্য-পারিশ্রমিক শোষণ করেই সেই সম্পত্তি তৈরি করেছে। সেজন্যই নাটকের সংলাপে দেখি—

'মাস্টার : ...আমরা যদি বড়লোকদের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাদের সব টাকা-জমিজায়গা-কলকারখানা জোর ক'রে নিয়ে নিই—তবে আমরা কার জিনিস নিলুম?'

উভয়ে (মকবুল ও গণেশ) : আমাদের, আমাদের, সব আমাদের নিজেদের জিনিস।

মাস্টার : তবেই বল্—নিজেদের জিনিস নিজেরা নিলে সেটা কি কখনও চুরি হয়, সেটা কি ডাকাতি হয়?

উভয়ে : না, কক্ষণো না। নিজেদের জিনিস নিজেরা নেবো। তাতে কার কী বলার থাকতে পারে?'[৫১]

এভাবেই দুই চোর নকশাল রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তাদের জীবনে। তারা রাজি হয়েছে নকশাল সংগঠনে যোগদান করার ক্ষেত্রে।

নকশাল আন্দোলনের অন্যতম পরিকল্পনা ছিল গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলা। এই নাটকেও সেই কথায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাস্টারের কথায়—

'...বিষ্টু ঘোষ গাঁয়ে থাকে, গ্রামে পুলিশের জোর বেশি নেই, শহরে কিন্তু পুলিশ-মিলিটারির জোর অনেক বেশি।...আগে গ্রামে গ্রামে ঐ বিষ্টু ঘোষের মতো শয়তানদের বাড়িতে ডাকাতি ক'রে হাত পাকাবো, শক্তি সঞ্চয় করবো, তারপর আমরা আসবো শহরে।'[৫২]

মাস্টার যখন এভাবে চোর দুজনকে প্রশিক্ষিত করছে তখন হঠাৎ করেই পুলিশবাহিনী তাদের ওপর চড়াও হয়। মাস্টারকে নির্মমভাবে তারা মারধর করে। তাসত্ত্বেও চোর দুজন তার সঙ্গ ছাড়েনি। কারণ মাস্টারের কথা তারা বুঝেছে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সেজন্যই সমস্ত বিপদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তারা আর পিছপা হয়নি। পরে তারা আবার মাস্টারের কাছে এসেছে। তখন মাস্টার একটি বই বার করে চোর দুজনকে কার্ল মার্ক্স, ফেড্রিক এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন ও মাও সেতুঙ-এর ছবি দেখিয়ে তাদের দলের আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিদের চিনিয়ে দিয়েছে। যদিও এখানে অধিক গুরুত্ব মাও সেতুঙ-কেই দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই গণেশ আর মকবুল ভারতবর্ষের মাও সেতুঙ-এর আশা করেছে। তারা সঙ্কল্প করেছে চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে নকশালদের ডাকাতি দলে যোগ দিয়ে শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার। তাই মাস্টারের কথা মত তারা তিনমাস পর জেল থেকে বেরিয়ে পার্টির পুরানো আখড়া সতেরোর তিন পাঁচু স্যাকরা লেনে গেছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু এবার তারা আর চোর বলে ধৃত নয়, তারা নকশাল।

নাটককার এই নাটকটি যখন রচনা করেন তখন নকশাল আন্দোলন অস্তমিত। সরকার ও পুলিশের অধিক তৎপরতায় তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাও নাটককার অমল রায় এখানে আশা রেখেছেন একটি নতুন ভোরের। সেজন্যই দর্শকদের উদ্দেশ্যে মকবুলের শেষ সংলাপ—

> '...জেনে রেখো বাবুরা—এখন চললাম বটে, কিন্তু আবার একদিন বেরুবো, নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসবো—তোমাদের সামনে, তৈরি থেকো, সেদিনের জন্য তৈরি থেকো সবাই—সেদিন সবকিছুরই হিসেবনিকেশ হবে। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের দিনে দেখা যাবে—কে কত শক্তি ধরে। সেদিনের আর বেশি দেরি নাই। তৈরি থেকো বাবুরা সব—তৈরি থেকো!'[৫৩]

নাটকটির মধ্যে যে মাস্টারের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে কমরেড দীনদয়াল পারিয়াল ওরফে সরযূপ্রসাদের ছায়া পড়েছে বলে নাটককার জানিয়েছেন। যিনি ১৯৭০/৭১ সালে নাটককারের সহবন্দী ছিলেন।[৫৪]

আট জোড়া খোলা চোখ :

২০ নভেম্বর ১৯৭০ সালে দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহের কানাই ভট্টাচার্য, যতীন দাস, সমীর মিত্র, গণেশ ঘটক, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তরুণ দাস, সমেন্দ্র দত্ত এবং স্বপন পাল এই আটজন নকশাল কর্মীর লাস বারাসাতের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।[৫৫] বারাসাতের এই হত্যাকাণ্ডকে বিষয় করে অমল রায় রচনা করেন 'আট জোড়া খোলা চোখ'।

কাহিনির শুরুতে দেখা যায় ১৯৭০ সালের ১৯ নভেম্বর সকলের নিভৃতে ভোররাতে একজন পুলিশ সহ তিনজন কংগ্রেসি গুন্ডা আটজন নকশাল কর্মীর লাস বারাসাতের রাস্তায় হাত-পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ফেলে দিয়ে আসে। শুরুতেই নাটককার দর্শকদের কাছে আটজনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পুলিশ ও গুন্ডাদের মারফৎ। সেখান থেকেই জানতে পারা যায় যতীন দাস ও কানাই ভট্টাচার্য টেক্সম্যাকোতে কাজ করত; প্রথমে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু পরে নকশালদের সঙ্গে যোগ দেয়। আর স্বপন পাল, টুকটুক দত্ত, শঙ্কর চ্যাটার্জী, সমীর মিত্র, গণেশ ঘটক, তরুণ দাস—এরা মূলত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নাটকের টুকটুক দত্ত বাস্তবে সমেন্দ্রনাথ দত্ত। তাদের মৃত্যুর খবর 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী', 'গণশক্তি', 'কালান্তর', 'স্টেটসম্যান', 'সত্যযুগ' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে, জনগণ তদন্তের দাবিতে মিছিল করেছে, পোস্টার মেরেছে, তাদের আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় লেখা হয়েছে কবিতা, গান, গল্প, নাটক। কিন্তু তাসত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডের উপর থেকে রহস্যের যবনিকা উঠেনি। অন্যদিকে পুলিশের নিরাপত্তায় সরকারের পোষা গুন্ডারা নির্দ্বিধায় সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সন্ত্রাস ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সেজন্যই খুন হওয়া ব্যক্তিদের মুখ দিয়েই নাটককার নিজের খেদোক্তি মেশানো প্রশ্ন উচ্চারণ করিয়েছেন।–

> 'তোমরা বলো আমরা আইন ভেঙেছি, প্রচলিত বিধি-বিধানকে করেছি অস্বীকার! যদি তাই করেই থাকি, তবে কেন তোমাদের আইনেই আমাদের বিচার করলে না? চোর-জোচ্চর-খুনী-গুন্ডা-স্মাগলারদেরও বিচার হয়, তাদেরও বিচার হয়, তাদেরও বক্তব্য শোনা হয়, অথচ আমাদের কেন

রাতের আঁধারে কাপুরুষের মতো হত্যা ক'রে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় নিষ্প্রাণ দেহগুলো ছড়িয়ে রাখা হলো বারাসাতের মাঠে?'[৫৬]

নাটকটির রাজনৈতিক চেতনায় নবারুণ ভট্টাচার্যের 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কবিতাটির প্রভাব সুস্পষ্ট। নাটকের নামও সেই কবিতা থেকেই গৃহীত। কবিতাটি উচ্চারিত হয়েছে ভদ্রলোক চরিত্রটির মুখে—

'আটজন মৃতদেহ

চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে

আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছি

আটজোড়া খোলা চোখ আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে

আমি চিৎকার করে উঠি

আমাকে তারা ডাকছে অবেলায় উদ্যানে সকল সময়

আমি উন্মাদ হয়ে যাব'[৫৭]

আবার চারজন জনতা চরিত্রের সংলাপে শোনা যায়—

১ম : যে পিতা তার সন্তানের লাস সনাক্ত করতে ভয় পায়—

তিনজন : আমি তাকে ঘৃণা করি।

২য় : যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে—

তিনজন : আমি তাকে ঘৃণা করি।

৩য় : যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানী—

৪র্থ : প্রকাশ্য রাজপথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না—

তিনজন : আমি তাকে ঘৃণা করি!'[৫৮]

শেষপর্যন্ত সরকার চাপে পড়ে একাধিক তদন্ত কমিশন তৈরি করে; কিন্তু কোনও কমিশনই খুনিদের গ্রেপ্তার করাতে পারেনি সমস্ত তথ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও। পশ্চিমবঙ্গ

সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠন করে সেই কমিশনকেও ভেস্তে দেয় গুন্ডারা। তারাপদ মুখোপাধ্যায়কে খুন করার চেষ্টা করলে ভয় পেয়ে তারাপদ কমিশনের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। এভাবেই তদন্ত কমিশনের নামে এক প্রহসনের ইতি ঘটে। আর আট শহিদের স্বজন পরিজনেরা তাদের হারানো মানুষগুলোর কথা প্রতিদিন স্মরণ করে চোখের জল ফেলে; কিন্তু অন্যদিকে হত্যাকারীরা বেপরোয়া হয়ে বেলেঘাটা, বরানগর, বহরমপুরের মতো আরও হত্যাকাণ্ড ঘটাতে থাকে।

নাটককার এই আটজনকে হত্যা করার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা করে সমগ্র নকশাল আন্দোলনকে নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানেই ধরা পড়ে কেন তাদের মতো শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুবরা আস্তে আস্তে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এবং কীভাবে তারা নিজেদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গোপনে শহরের মধ্যে চালাত। এখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে ভদ্রলোক চরিত্রটি। এই চরিত্রটি আসলে নাটককারের প্রতিবাদী সত্তারই রূপান্তর। সে একই সঙ্গে কাহিনির কথক ও সূত্রধারের ভূমিকা পালন করেছে।

যতীন ও কানাই উভয়েই সি. পি. আই. (এম.) পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়েই অনুভব করে সংসদীয় পথে কেবল মন্ত্রী বদল হয়, শোষণের অবসান হয়না। ট্রেড-ইউনিয়নের মাধ্যমে আন্দোলন করে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় করেও তাদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে না। মালিক রাজের জায়গায় চাষি-মজুরের রাজ কায়েম করা এই পথে সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের সামনে তেমন কোনও পথ খোলা ছিল না। ঠিক এই মুহূর্তে তরাই অঞ্চলে 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'-এর আওয়াজ শোনা গেলে তারা আর নিজেদেরকে সে পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ভোট-যুদ্ধ ছেড়ে তারা সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। রিজিওনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সার্কুলার অনুযায়ী তারা রাজনীতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এদের প্রভাব শহরাঞ্চলে ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও চুপ করে বসে থাকেনি। মণি গুন্ডাদের মতো সমাজ-বিরোধীরা আক্রমণ করেছে বারবার। ফলে যতীন ও কানাই-এর মতো শ্রমিকরা নিজেদের কাজ ছেড়ে শহর ছেড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। কারণ—

'আসল লড়াইটা যে গ্রামে, শহরের লড়াইটা পরিপূরক মাত্র।...আসলে শহরে ওদের শক্তি অনেক বেশি, এখানে ওরা অনেক বেশি সংগঠিত। কিন্তু ওদের দুর্বল জায়গা হচ্ছে ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল।'[৫৯]

সুতরাং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার তাগিদেই তারা শহর ছাড়ে এটা জেনেও যে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়িতে 'হাঁড়ি চড়বে না'। 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'-এর বিপ্লবের মধ্যে মুক্তির বাণী শহরের ছাত্র-যুবদেরও আকর্ষণ করে প্রবলভাবে। মুরারি মুখার্জীর সংস্পর্শে শংকর, গণেশ, স্বপন ও টুকটুক নকশাল আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে এবং শংকরের ছাত্র ক্লাস নাইনে পড়া তরুণও নিজেকে বাইরে রাখতে পারে না। এরা প্রত্যেকে নিজেদের বিপ্লবী কাজে সক্রিয় করে তোলে। মাও সেতুঙ, লেনিন, স্তালিনের বই পড়ে; দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লাগায়। অনেক অভাব-অনটনের মধ্যেও একে-অপরের পাশে থাকে।

এইসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। নেমে আসে সন্ত্রাসের ছায়া। 'দেশব্রতী' পত্রিকার অফিসে পুলিশ তল্লাশী চালায়, মুরারি মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করে হাজারীবাগ জেলে বন্দি করে রাখে, গৌরকে গোসাবায় জোতদারের গুন্ডারা খুন করে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি সন্ত্রাস কায়েম হয়। পুলিশ ও গুন্ডারা একসঙ্গে দমন অভিযানে নেমে পড়ে। শেষপর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের এই আটজনকে দমন করতে প্রশাসন অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। নেতার পরামর্শে তার কয়েকজন গুন্ডা নকশাল ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের দলে ঢুকে পড়ে এবং গোপন খবর সংগ্রহ করতে থাকে। সেই সূত্র ধরেই শেষপর্যন্ত ১৯ নভেম্বর মনুমেন্টের ময়দানে এক মিটিং-এ পুলিশ ও সরকারের পোষা গুন্ডারা তাদের ঘিরে ফেলে। থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে বারাসাতের রাস্তায় ফেলে আসে।

নকশালদের খতমের অভিযানকে একসময় অনেকেই সমাজ-বিরোধী আখ্যা দিয়েছিল, সাধারণ জনগণ থেকে ক্রমশ তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের রাজনীতির পন্থা নিয়ে অনেকেই সমালোচনায় মুখর হয়। সেই সুযোগ গ্রহণ করে রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন তাদের দমন করতে ব্যাপকহারে সন্ত্রাস চালায়। হয়ত তাদের পন্থাতে ভ্রান্তি ছিল, হঠকারিতা সেক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হয়েছিল। যত দিন গেছে ততই তারা সংগঠনের উপর জোর না দিয়ে, জনগনের মধ্যে নিজেদের রাজনীতির লাইনের প্রসার না ঘটিয়ে

কেবলমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এলাকা দখলের মাধ্যমে মুক্তাঞ্চল গঠন করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য যে নিছকই সমাজবিরোধী ছিল—নাটককার একথা সমর্থন করেন না। তারা শোষণমুক্ত সমাজ যে গড়তে চেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই নাটকের রাজনৈতিক চেতনা এখানেই যে, দর্শকের কাছে তাদের স্বপ্নের কথা তুলে ধরা। তাই ভদ্রলোক চরিত্রটি বলেছে—

> 'আমি জানি না—যতীন-কানাইয়ের পথটাই সঠিক কিনা। তাদের পথের ভুলভ্রান্তি নিয়ে বিচার করবে আগামী দিনের মানুষ। কিন্তু এটা বুঝি—যতীন-কানাইরা রাজনৈতিক কর্মী ছিল, দেশের ব্যাপক জনতার শোষণমুক্তির স্বপ্নে বিভোর ছিল তারা, তারা আর যাই হোক খুনী গুণ্ডা-এ্যান্টি সোস্যাল এলিমেন্ট ছিল না, হাফ-হুলিগান-হাফ পলিটিশিয়ানও ছিল না। তারা তো এম. এ. এল. এ. বা মন্ত্রী হয়ে গুছিয়ে নেবার জন্যে বামপন্থী রাজনীতি করতে আসেনি। তারা যা বিশ্বাস করেছে, তার জন্যে চরম মূল্য দিতেও পেছুপা হয়নি কখনো, আর যাই হোক—তাদের নিষ্ঠা আর সততায় কোনো খাদ ছিল না।'[৬০]

যেখানেই অত্যাচার :

কাশীপুর-বরানগর গণহত্যার পটভূমিতে অমল রায় রচনা করেন 'যেখানেই অত্যাচার'। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর নকশাল রাজনীতি এবং তা দমনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্যমী পদক্ষেপের প্রভাব এখানে দর্শিত। চরিত্রের মধ্যে আছে কেয়া, সুকুমার, হরনাথ, বিমলা, অঘোর প্রভৃতি। নাটকটির শুরুতে নেপথ্য আবহে নকশাল রাজনীতি দমনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির রণহুংকারের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন নাটককার—

> 'পর পর কতগুলো বোমা ফাটার শব্দ, কোলাহল, আর্তনাদ, স্লোগান—বন্দে মাতরম্, সমাজতন্ত্র আসছে—আসবে; এক দল—এক দেশ—এক নেতা—দেশদ্রোহীদের খতম করা চলছে—চলবে; ইত্যাদি'।[৬১]

এরকম পরিস্থিতিতে একটি যুবক আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হরনাথ বিশ্বাসের বিধবা পুত্রবধূ কেয়ার ঘরে আত্মগোপনের সূত্রে প্রবেশ করে। যুবকটির পরিচয়ে জানা যায় সে প্রভাবশালী নকশাল নেতা সুকুমার চৌধুরী, যার মাথার মূল্য সরকার আড়াই

হাজার টাকা ধার্য করেছে। তার প্রবেশে বাড়ির সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে যে সংলাপের আদান-প্রদান ঘটে তাতে সেই পরিবারের অবস্থা এবং তৎকালীন রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

হরনাথ-বিমলার একমাত্র পুত্র তথা কেয়ার স্বামী রমেন বিশ্বাস একসময় নকশাল রাজনীতি করত। সেজন্য পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানার ভিতরে পিটিয়ে খুন করে এবং বাইরে প্রচার করে সে জেলের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে বলে। একমাত্র পুত্রের অবর্তমানে তাদের সংসার চালানো দায়। হরনাথ বিশ্বাস অবসর গ্রহনের পরেও কাজের সন্ধানে বেরিয়েছে। এমনকি শেষপর্যন্ত যারা তার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী তাদের কাছেও সাহায্য চেয়েছে। এমনকি সে এও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ছেলের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বিধবা কেয়াও চাকরির জন্য সমাজ বিরোধী গুণ্ডা অঘোরের শ্মরণাপন্ন হয়েছে। যে অঘোর তার স্বামীকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে কেয়া মেলামেশা করেছে, লজ্জা বিসর্জন দিয়েছে। কারণ অঘোরের মতো ব্যক্তিরা বিনা প্রতিদানে কিছুই করে না। এসব দেখে বিমলা চুপ থাকতে পারেনি। একটা রুচিশীল পরিবারের পুত্রবধুর এরকম পথ অবলম্বন তার সহ্য হয় না। সে হরনাথকে কাপুরুষ বলতেও পিছপা নয়, আবার কেয়ার এরকম পদস্খলন দেখে বারবার কেয়াকে অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে সমগ্র নাটকে। আবার এই বিমলা চরিত্রটিও নাটকে মহান হয়ে ওঠে। বিমলা পাড়ার লম্পট ছেলে অমিয়র কথাতে জুয়া খেলে বড় অঙ্কের টাকা জয়ের স্বপ্ন দেখে, কারণ তা বাস্তবায়িত হলে সংসারের অভাব দূর হবে, কেয়ার মর্যাদা রক্ষা পাবে।

এতদবস্থায় জানা যায় পুলিশ ও গুন্ডারা সমগ্র অঞ্চলকে ঘিরে ফেলেছে এবং সুকুমার চৌধুরীর আত্মগোপনের স্থান তাদের জানতেও বাকি নেই। এসময় সেখানে তাহের এসে সেখান থেকে সুকুমার চৌধুরীকে সেখান থেকে বার করে নিয়ে যায়। এই তাহের এক সময় রমেনের সঙ্গে নকশাল রাজনীতি পন্থা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু রমেনের হত্যার পর সে সেই পথ পরিত্যাগ করে অঘোরদের মতো গুন্ডাদের সঙ্গে গিয়ে মিশে। এর জন্য তার উপর প্রথমে ভরসা করতে সকলে সঙ্কোচবোধ করে। তবে তাহের নিজের পরিস্থিতি রমেনের পরিবারকে বোঝাতে পেরেছিল। সেজন্যই শেষপর্যন্ত তার উপর সকলে ভরসা রাখে। নাটকের অন্তিমে কেয়া চরিত্রটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে। এই কেয়া অঘোরের সঙ্গে মেলামেশা করেছে ঠিকই, কিন্তু তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য

অপরাধী এই অঘোরকে সে ক্ষমা করেনি। সে গোপনে নকশাল সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে, তাদের কাছে অঘোর ও তার দলের সমস্ত তথ্য সে পাচার করেছে। এখানেই কেয়া বীরাঙ্গনা হয়ে ওঠে।

পঙ্কজ দত্ত আসছেন :

আদালতে পাঁচ নকশাল বন্দিদের বিচারকে কেন্দ্র করে অমল রায়ের 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন' (১৯৭৭) নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে নকশালদের চোখে দেশের বিচার ব্যবস্থার অবস্থান, নকশাল রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ এবং তাদের রাজনৈতিক লাইন। নাটকের শুরুতে ভাষ্যকারের দীর্ঘ সংলাপে ধরা পড়ে নাটকটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—

> '...আমাদের সচেতন সতর্কতার ব্যারিকেডে যাতে কোনো ফাটল না ধ'রে—যাতে বিগত উনিশ মাস তথা বিগত সাত আট বছরের রক্তরাঙা অধ্যায়টিকে আমরা ভুলে না যাই, যাতে সেই দিনগুলির অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে আজও শিক্ষা নিতে পারি—সর্বোপরি সেই বীভৎস দুঃসময়ে যে পেশাদার খুনী গুপ্তঘাতকের দল দিল্লীর বেগমসাহেবার মদির ভ্রুভঙ্গের ইঙ্গিতে এই দেশের শত শত তরুণ প্রাণের রক্ত ঝরিয়েছিল, তাদের কেউ যাতে আজকে রেহাই না পায়, যাতে তারা দিন বদলের দিনে উর্দি বদলিয়ে আমাদের মধ্যে মিশে যেতে না পারে—যাতে প্রতিটি হত্যাকারীকে আমরা খুঁজে বার ক'রে তাদের প্রাপ্য শাস্তি দিতে পারি—সেই জন্যেই আমাদের আজকের নাটক'।[৬২]

নাটকের কাহিনির শুরু হয়েছে আদালতের দৃশ্য দিয়ে। সেখানে পাঁচজন নকশাল বন্দির বিচারের এজলাস বসতে চলেছে। যারা আইনের চোখে 'ফেরোসাস ক্রিমিন্যাল, মানে যাকে ব'লে দাগী দেশদ্রোহী'। তা দেখার জন্য আদালতের বাইরে সাধারণ জনগণের উপচে পড়া ভিড় এসে হাজির—যা সামাল দিতে পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। বন্দিদের উপরে চেপেছে দেশদ্রোহিতার মামলা—কারণ তারা বিদেশের (চিন) উস্কানিতে দেশের প্রতিষ্ঠিত

সরকারকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে। কিন্তু এই বিচার নিছক একটি লোক দেখানো ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই না। তাদের আসল উদ্দেশ্য নকশাল বন্দিদের খতম করা। সেজন্যই পুলিশ অফিসারকে বিরক্ত হয়ে বলতে শুনি—

> ‘এই সব বিচার-টিচারের কি দরকার ছিল মশাই? রাতের অন্ধকারে সব কটাকে মেরে আমডাঙ্গার মাঠে ফেলে দিয়ে এলেই হতো! এমন তো কত করেছি’।[৬৩]

বিচারের এজলাস সাজানো হয়েছে এমনভাবে যাতে এই পাঁচজন বন্দি কোনও ভাবে বাঁচতে না পারে। তিনজন জুরি-র মধ্যে রয়েছে ভূস্বামী গোবিন্দ সামন্ত, শিল্পপতি অমল নাথ এবং সমাজবিরোধী তথা কংগ্রেসি গুন্ডা মুকুল নন্দী ওরফে কাটা ফুটো। প্রত্যেকেই ছিল নকশালদের চোখে শ্রেণিশত্রু এবং যাদের নকশালরা খতমের অভিযান চালিয়েছিল। সুতরাং বন্দিদের হয়ে কথা বলবে এমন কারও অবস্থান জুরিদের মধ্যে নেই। আর এই বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বন্দিদেরও নেই; কারণ নকশালদের চোখে শোষক শ্রেণির আদালতে ন্যায়বিচার হয় না। নকশালদের চোখে শোষক শ্রেণি বলতে ভূস্বামী, শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের বোঝায়। যারা একচেটিয়া আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা উপভোগ করে এবং বিচার বিভাগও যার বাইরে নয়। সেজন্যই নাটকে এই বিচারের প্রতিবাদে বন্দিরা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও উকিল মোতায়েন করেনি।

সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনে যেমন যুবশক্তির ব্যাপক যোগদান ছিল ঠিক তার বিপরীতে আরেক দল যুবশক্তির উন্মেষ নজরে আসে; যারা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়ে পুলিশের সঙ্গে নকশাল আন্দোলন দমনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এদের বেশির ভাগটাই ছিল সমাজবিরোধী, সরকারের ছত্রছায়ায় থেকে এরা সাতের দশকের সমাজে এক সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। বিভিন্ন নাটকে এই দিকটা উঠে এসেছে। ‘পঙ্কজ দত্ত আসছেন’ নাটকেও এই প্রসঙ্গ ধরা পড়ে বন্দিদের সংলাপে—

> ‘২য় বন্দী : বিগত কয়েক বছরে যুবশক্তির দু’ধরণের প্রকাশ দেখেছেন আপনারা—সাতষট্টী থেকে সত্তর-একাত্তরে বিশেষত

উনসত্তর-সত্তর একাত্তরে—একদল ছেলে যৌবনের উদ্দীপনায় গরীব মানুষকে, মেহনতী মানুষকে ভালবেসে—চিরনিপীড়িত চাষী-মজুরের দুঃখ ঘোচাতে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছিল—দেশকে ভালবেসে। সাধারণ মানুষকে ভালবেসে তারা মৃত্যুবরণ করেছে বীরের মতো, হাসিমুখে নির্যাতন সয়েছে অকাতরে—এরা যৌবনের একটা দিক, তার গৌরবের দিক!

বন্দিনী : আর ঐ খুনে মস্তানরা আরেকটা দিক—যৌবনের বিকৃতির দিক—বাহাত্তর সাল থেকে যাদের আমরা দেখছি—যারা খুনী, যারা গুণ্ডা, যারা ওয়াগণ ভাঙ্গে, যারা মদ খায়, জুয়া খেলে, প্রকাশ্য রাজপথে মেয়েদের অসম্মান করে—তারাই আবার যখন রাজনীতির কথা ব'লে, দেশপ্রেমের বুলি আওড়ায়, এম. এল. এ. হয়, মন্ত্রী হয়ে চুরি জোচ্চুরি করে রাতারাতি লাখপতি হয়ে যায়—আর নিজেরাই নিজেদের 'যুগ যুগ জিও' বলে তখন আমরা, যারা মানুষের ভালো করতে গিয়ে হাজারে হাজারে জেলের ভেতর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি—সেই আমাদের হাসি পায়, ভীষণ হাসি পায়।

৪র্থ বন্দী : তারাই হয়েছে আমাদের মামলার জুরি। চমৎকার, চমৎকার গণতন্ত্র।'[৬৪]

নাটকটি রচনা করা হয়েছিল জরুরি অবস্থার পর। নকশাল আন্দোলন তার অনেক আগেই দমিত হয়েছে। তা দমন করতে যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে তার বহু কথা নাটকটিতে উঠে এসেছে। তবে নাটকটির মূল কাহিনি রচিত হয়েছে নকশাল নেতা সরোজ দত্তর মৃত্যু রহস্যকে ঘিরে। সরোজ দত্তই হয়েছে এখানে পঙ্কজ দত্ত। কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায়, আদালতে পুলিশ অফিসার জানিয়েছে পঙ্কজ দত্ত ফেরার। তার বর্তমান ঠিকানা

কেউ জানে না। পুলিশের এই কথাতেই পাঁচজন নকশাল বন্দিদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। তারা জোরের সঙ্গে দাবি করে, পঙ্কজ দত্তকে রাজা বসন্ত রায় রোডে অবস্থিত তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ভোরবেলায় ময়দানে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু পুলিশ অফিসার এই কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। পুলিশ নিজের সমর্থনে সাক্ষী উপস্থিত করেছে অধমকুমার চক্রবর্তীকে (প্রখ্যাত বাংলা সিনেমার অভিনেতা উত্তমকুমারকে নাটকে এই নাম দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু তার সাক্ষীতে গলদ দেখা দেয়। তাসত্ত্বেও পুলিশ নিজের বক্তব্য থেকে সরে না। শেষপর্যন্ত পুলিশের মুখ দিয়েই স্বীকার করানো হয়েছে তার অপরাধ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। এক ব্যক্তি পঙ্কজ দত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করে সবার সামনে হাজির হয় এবং নানা উপায়ে প্রমাণ করে যে সেই পঙ্কজ দত্ত। কিন্তু পুলিশ তাকে পঙ্কজ দত্ত বলে মানতে পারে না। অবশেষে বিচারক ও জুরিদের চাপে পুলিশ অফিসার স্বীকার করে নেয় যে সেই পঙ্কজ দত্তের হত্যাকারী এবং সেই হত্যাকাণ্ড অধমকুমার চক্রবর্তী প্রত্যক্ষ করেছে। সেজন্য একমাত্র সাক্ষীকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে চুপ থাকতে।

পদাতিক :

অমল রায়ের পাশাপাশি নকশাল আন্দোলন নিয়ে নাটক রচনায় আর একজন অগ্রগণ্য নাটককার ছিলেন মনোরঞ্জন বিশ্বাস। অমল রায়ের মতো তিনিও নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একাধিক নাটক রচনা করেছিলেন। অমল রায়ের নাটকগুলি মূলত ছিল কলকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে নকশালদের কার্যকলাপ এবং তা দমনে পুলিশ প্রসাশনের সক্রিয়তা কেন্দ্রিক, সেখানে মনোরঞ্জন বিশ্বাস নিজের নাটকে গ্রাম্য পটভূমি ব্যবহার করেছেন। 'জননী' (১৯৬৯), 'দাদন' (১৯৭১), 'রণক্ষেত্রে আছি' (১৯৭৩), 'ভোটান যাত্রা' (১৯৭৪) ইত্যাদি একাধিক একাঙ্কে নকশাল আন্দোলনের বিষয় উপস্থিত হয়েছে। তবে সে দিক থেকে তাঁর 'পদাতিক' (১৯৭৩) পূর্ণাঙ্গ নাটকটি আলাদা করে আলোচনার অবকাশ রাখে।

ভারতবর্ষের বৃহত্তর সমস্যা সামন্ত-ব্যবস্থা। গ্রামের সাধারণ কৃষকরা এই ব্যবস্থার শোষণে জর্জরিত দীর্ঘকাল থেকেই। যার উচ্ছেদের সংকল্পেই নকশাল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। মনোরঞ্জন বিশ্বাস 'পদাতিক' নাটকে এই সামন্ত ব্যবস্থায় কৃষকদের শোষণযন্ত্রণা

চিত্রিত করেছেন। এবং তার পাশাপাশি দেখিয়েছেন নকশাল আন্দোলনের ডাকে শোষিত কৃষকরা শোষণের হাত থেকে মুক্ত হতে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

নাটকটি শুরু হয়েছে পৌষ-সংক্রান্তি দিয়ে। ঘরে নতুন ধান উঠবে এই আশায় কান্তর স্ত্রী আশা উঠান জুড়ে আলপনা দিয়ে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকছে, মঙ্গল ঘট বসানোর আয়োজন করছে। এমন সময় সেখানে আসে ভীম। তার ঘরে দুদিন খাবার জোটেনি, সারাদিন তাকে খামারে কাজ করিয়ে জোতদারের গোমস্তা মজুরি দেয়নি। সেজন্য কান্তর কাছে চাল ধার চেয়েছে। কিন্তু কান্তর ঘরেও চাল বাড়ন্ত, এমনকি লক্ষী পুজোর জন্যও আশা অন্যের ঘর থেকে ধান ধার চেয়ে এনেছে। কান্তর পরিবার অধীর আগ্রহে বসে আছে কখন কান্তর বাবা তাড়ক সর্দার মাঠ থেকে ধান নিয়ে আসবে। কিন্তু রাসু এক দুঃখের সংবাদ নিয়ে আসে—মাঠের ধান গাড়িতে বোঝাই করে তাড়ক বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে এমন সময় জোতদার বৈষ্ণব হালদারের লোক দাদনের অছিলায় গাড়ি সমেত বোঝাই ধান নিয়ে চলে যায় বৈষ্ণব হালদারের বাড়ি। এই খবর শুনে কান্তও ছুটে জোতদারে বাড়ি।

বৈষ্ণব হালদারের গোলবাড়িতে দেখা যায় ভাগচাষী অধর, লাতিফ ও নগেনের ধান মাপা হচ্ছে। মিথ্যে দাদনের দায়ে তাদের বেশিরভাগ ধান জোতদার লুঠ করছে। আবার তাড়ক সর্দারের উপরেও অতিরিক্ত দাদনের বোঝা চাপিয়েছে যা সে নেয়নি। বৈষ্ণব হালদার জানিয়েছে তার তিন বছরের দাদন বাবদ ৭০০ টাকা, ধান বাবদ ৬০ টাকা এবং জনমুনিষের খরচ বাবদ ৭০ টাকা কর্জ। কিন্তু তাড়ক জানে তার কর্জ কেবল দু'বিশ অর্থাৎ ৪০ টাকা, যার রসিদও তার কাছে আছে। দাদনের এই বোঝায় হতাশ অধর ও লাতিফ বলেছে—

'অধর : মহাজনের দিনা এ জনমে শোধ হবে না,

লাতিফ : না, কবরে গেলিও শোধ হবে না।'[৬৫]

একদিকে তাড়ক গোলবাড়ি থেকে ঘরে যায় দাদনের রসিদ আনতে আর অন্যদিকে কান্ত গোলবাড়িতে আসে। তাদের সমস্ত ধান কেড়ে নেওয়ার জন্য সে প্রতিবাদ করে। পরিণামে বৈষ্ণব হালদার গুন্ডা লাগিয়ে কান্তকে হত্যা করেছে।

নাটকের কাহিনিতে একদিকে যেমন জোতদারদের এই শোষণ বর্ণিত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে লক্ষণ বাউড়ির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। তারা জোতদার শুধাংশু সরকারের আড়ত লুঠ করে গ্রামের গ্রামের গরিবদের মধ্যে বিলিয়েছে। বিদ্রোহের চোটে শুধাংশু পলাতক, সুদের কাগজ সমেত তার কাছারিবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, বন্দকি জমির দলিল, পাট্টা, সব ফিরিয়ে দিয়েছে, সমস্ত সম্পত্তি গ্রামের গরিব চাষিদের বলে ঘোষণা করেছে।

কান্তর মৃতদেহ নিয়ে লক্ষণ তাড়কের বাড়ি আসে। কান্তর পরিবারকে শ্রেণিশত্রু চিনিয়ে দেয়। তাড়কের উদ্দেশে লক্ষণ বলে—

> 'কাকা, আমরা জানি, আমরা জানি অত্যাচার কি, উৎপীড়ন কি, দুঃখ কি...যন্ত্রণা কি, আপনি জানেন, এই লাতিফ জানে, নগেন জানে, এই গগন জানে তাই আপনাকে বলব আমরা কেউ কাঁদব না, আমরা কান্নাকে প্রতিশোধের আগুন করে তুলব যতদিন না পর্যন্ত হত্যাকারীকে আমরা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারছি।'[৬৬]

আশাকে দ্রৌপদীর কথা শুনিয়ে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে। কান্তর ভাই নবকে বলেছে—

> 'কান্ন নয় ভাই, আজ আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন। তুমি না চাষার ছেলে? বল তো কি আছে তোমার? জমি আছে? কাজ আছে? ঘরে ভাত আছে?...তোমরা কি ভাব বেষ্ট হালদার কাঁদতে কাঁদতে এসে বলবে যা হয়েছে তা হয়েছে, মাপ করো—আর কক্ষনো খুন করব না।'[৬৭]

এভাবেই তাড়ক ও তার পরিবার চিনতে পারে নিজেদের শ্রেণিশত্রুকে, বুঝতে পারে এই শত্রুর উচ্ছেদ না হলে তাদের মুক্তি নেই। আশা তার বীর স্বামীর প্রতিজ্ঞায় সিঁথির সিঁদুর মোছে না। তারা যোগদান করে নকশাল আন্দোলনে। গ্রামের চাষিরাও সংগঠিত হয়ে জোতদার বৈষ্ণব হালদারের গোলাবাড়ি আক্রমণ করে। জোতদারকে আটক করে তার বিচার চলে। কিন্তু বিচারের পরিসমাপ্তির ধৈর্য আর আশা ধরতে পারে না। সে বৈষ্ণব হালদারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরে। এমন সময় সেখানে পুলিশ আসে। গর্ভবতী আশাকে বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে, নবকে মারতে মারতে রক্তাক্ত অবস্থায়

নিয়ে যায় বাড়িতে তাড়ক সর্দারের সামনে। তাও তাড়ক মাথা নত করেনি। ফলে সেখানেই পুলিশ গুলি করে নবকে হত্যা করে। এই নৃশংসভাবে দুই পুত্র এবং পুত্রবধূর হত্যার প্রতিবাদের তাড়ক গর্জে উঠে এবং নাটকের পরিসমাপ্তিতে এর প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করে।

বাদল সরকার :

বাদল সরকারের ওপর নকশাল রাজনীতির প্রভাব পড়েছিল পরোক্ষভাবে। নকশাল রাজনীতির একটি মুখ্য স্লোগান ছিল 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো'। তা সফল করতেই সেই সময়ের একদল শিক্ষিত যুবক গ্রামে চলে যায়, সেখানকার গরিব মানুষের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হন এবং তাঁদের সচেতন করেন। এভাবেই নকশাল রাজনীতির মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হয়েছিল। শহরের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যখন নকশাল রাজনীতি নিয়ে শহুরে মানুষের সামনে নাটক উপস্থাপিত হচ্ছিল তখন বাদল সরকার তাঁর 'শতাব্দী' নাট্যদল নিয়ে চলে গেলেন গ্রাম-পরিক্রমায়। তবে তাঁর নাটকে গ্রামের পাশাপাশি শহরের চিত্রও উঠে এসেছে এবং তার প্রযোজনাও হয়েছে উভয় জায়গায়। ফলে গ্রাম বুঝেছে শহরকে আর শহর বুঝেছে গ্রামকে।

লক্ষীছাড়ার পাঁচালী :

বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার পর্যায়ের নাটক 'লক্ষীছাড়ার পাঁচালী' (১৯৭৪)-তে কৃষকদের উপর মহাজনী শোষণের এক টুকরো চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। কবিগানের ঢঙে রচিত এই নাটকের 'মুখবন্ধ'-এ নাটককার লিখেছেন—

> 'লিখেছিলাম শহরের জন্য। আমার শহরে বড়ো হওয়া; গ্রামের খবর না জেনে কেটে গেছে জীবনের বেশির ভাগ। তার মানে দেশের বারো-আনার খবর না জেনে।

যখন জানতে শুরু করলাম, তখন মনে হোলো, আমারই মতো অনেক শহরবাসী যা এতোদিন জানেননি, তাঁদের জানানো দরকার। যেটুকু জ্ঞান হয়েছ, সেইটুকুই জানানো দরকার। তাই এই কবিগান লিখেছিলাম শহরবাসীকে উদ্দেশ্য করে।'[৬৮]

নাটকটির দুটি চরিত্র পচা ও খুড়ো যথাক্রমে গ্রামের সাধারণ কৃষক এবং মহাজনদের প্রতিনিধি। এখানে উঠে এসেছে সমাজের অসম বণ্টনের কথা। একদিকে মহাজনদের কাছে আছে বিপুল সম্পত্তি, আবার অন্যদিকে কৃষকরা অর্থের অভাবে না খেতে পেয়ে দিনযাপন করে। সম্পদের এই অসম বণ্টন মহাজনী শোষণের ফল। কাগজে কলমে লিখিত সরকারি আইনকে ফাঁকি দিয়ে তারা এই শোষণ চালিয়ে যায়। তাই পচা আক্ষেপে বলে উঠে—

'বাবুর টাকা বিদ্যেবুদ্ধি পরিশ্রমে নয়

আমাদেরই রক্ত চুষে বাবুর টাকা হয়

আরো টাকা খাটায়।'[৬৯]

পচার কথায় ধরা পড়ে কীভাবে মহাজনরা অভাবের সময়ে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দিয়ে তাদের সমস্ত জমি দখল করে নেয়। ফলে যে কৃষক ছিল জমির মালিক, সেই পরবর্তীতে ভাগচাষিতে পরিণত হয়। কিন্তু তারপরেও মুক্তি নেয়। সরকারি আইনে ফসলের বারো আনা ভাগ ভাগচাষির পাওয়ার কথা, কিন্তু অর্ধেকের বেশি কেউ পায় না। তার উপর মহাজনরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মজুত রেখে কৃত্রিমভাবে বাজারে অভাব তৈরি করে মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। শোষণের এইরূপ পচা তুলে ধরলে খুড়ো স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু পচার তাতে বিশ্বাস নেই। সে মনে করে না খোলা বাজারে বেচা-কেনা করে তাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হতে পারে। কারণ সেই বাজার মহাজনদের দখলে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সেজন্যই নাটকের অন্তিমে পচার তথা নাটককারের সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি বিশ্বাস উচ্চারিত হয়।–

'সাধ্যমতো খাটবো সবাই,

যার যা দরকার নিয়ে যাবো,

কেনা বেচায় কী ফল পাবো?

ভাগ করে সব খাবো।'[৭০]

নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র :

'নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র' নাটকেও উঠে এসেছে কয়েকটি সমস্যার কথা। যে সমস্যাগুলি নকশাল আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল। নাটকটির নামের ক্ষেত্রে বাদল সরকার ইতালির পিরানদেল্লা ও নান্দীকারের অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। কিন্তু নাম ছাড়া বাকি অংশ নাটককারের নিজের। এখানে তিনি যে তিনটি চরিত্র রূপায়ন করেছেন তারা সমাজের তিনটি শ্রেণির অন্তর্গত। তাদের নামকরণও করেছেন সেই ভাবেই—দামী, মাঝারি ও সস্তা।

দামী একজন ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা। মাঝারি শিক্ষিত কর্মহীন পথভ্রষ্ট যুবক এবং সস্তা হলো গ্রামের চাষি। আধা-উপনিবেশ, গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে এই তিন শ্রেণির মানুষ বর্তমান। যারা নিজের কথা বলার জন্য নাট্যকারকে খুজছেন। দামী চাইছেন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে। জনসাধারণের কাছে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশের মানুষের সে সম্বন্ধে যে পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা সেটা তুলে ধরতে। বেশি করে জোর দিতে চান ফ্যামিলি প্ল্যানিং, অ্যাটম বোম, দেশের সুরক্ষা ইত্যাদির দিকে। এসব বিষয় নিয়ে তিনি নাট্যকারকে বলেন নাটক লিখতে।

মাঝারির কাছে ডিগ্রী আছে—বি এস সি (অনার্স)। কিন্তু চাকরি না থাকায় তীব্র ক্ষোভে সে চায় যুদ্ধ করতে সরকারের সঙ্গে। শ্রেণি-সংগ্রামের যুদ্ধ। সেজন্য তার প্রয়োজন গ্রামের চাষিদের, কল-কারখানার শ্রমিকদের। সেই সূত্রেই নাট্যকারকে প্রলেতারিয়েত সমাজের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শক্তির কথা নিয়ে নাটক লিখতে বলেন। মাঝারি নাট্যকারকে নির্দেশ দিয়েছে—

> 'নাট্যকার হিসেবে তোমার দায়িত্ব—ওকে (সস্তাকে) সচেতন করা। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া—কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ও। ওর মনে বিশ্বাস জাগানো।

ওর বুকে সাহস আনা। ওর চোখে আশার আলো ফোটানো।...এই সমাজ—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাস কীরকম হয়, সেটা আগে জানা দরকার। তারপর জানা দরকার আমাদের ভারতবর্ষের আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশ এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বর্তমান—'[৭১]

গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে আমাদের দেশে কেবল ভোটের অধিকার বোঝায়। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভোটের পর আর পূর্ণ হয়না। এটি আজও সত্য। সেজন্য সস্তা-র মুখে শুনতে পায় গ্রামের খালকাটা আর হয়না, ইলেকট্রিসিটিও আর আসে না, জিনিসপত্রের দাম নিত্যদিন বাড়ে। দুর্বিষহ হয় সস্তার জীবন। মৌলিক চাহিদাগুলো অন্তত যেন পূরণ হয়, সেজন্য তিনি নাট্যকারকে এমন একটি নাটক লিখতে বলেন যেখানে থাকবে জলের কথা, সারের কথা, ওষুধের কথা, ডিজেলের কথা। নাট্যকারকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে সস্তার চাহিদাগুলি। তিনি বুঝতে পারেন জনসাধারণের মৌলিক চাহিদাগুলি না মিটলে তার কাছে কোনও তত্ত্ব কথা বা অন্যান্য উন্নয়নের কোনও মূল্য থাকে না। সেজন্যই এই নাটকে শেষপর্যন্ত নাট্যকার গ্রামে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, যাতে তিনি সস্তাদের জীবনযাপনের মধ্যে যে প্রাথমিক সংকটগুলি বিদ্যমান সেগুলিকে নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরতে পারেন।

ভোমা :

গ্রামীণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে বাদল সরকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল 'ভোমা' নাটকটি। ১৯৭৪ সালে বাদল সরকার 'কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডিভেলপমেন্ট করপোরেশন' (সি. এ. ডি. সি.)-এ যোগ দেন 'ডাইরেকটর অভ প্ল্যানিং' হিসেবে।[৭২] এরপর থেকে তিনি বিভিন্ন গ্রামে ঘুরেছেন, গ্রামকে জেনেছেন কাছ থেকে। ভোমার কথা নাটককার প্রথম শুনেছিলেন রাঙাবেলিয়া গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। যে ভোমা এক সময় বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে একটা চোখ হারিয়েছিল এবং তার গালে সৃষ্টি হয়েছিল গভীর ক্ষত।[৭৩] এখান থেকেই বাদল সরকারের মাথায় 'ভোমা' নাটকের পরিকল্পনা আসে। তবে 'ভোমা' নাটকে যেসব বিষয় ধরা পড়েছে সেগুলি শুধুই রাঙাবেলিয়ার অভিজ্ঞতায় নয়। সেগুলি

বেশ কয়েক বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফসল। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

> 'নাইজেরিয়া থেকে ফিরে আমি বেকার ছিলাম, সেই সময় সপ্তাহে আমি দেড়দিন দু-দিন করে রামচন্দ্রপুর, সিংজোল, যেখানে বারীন ছিল, এই সমস্ত অঞ্চলটা বনগাঁ অঞ্চলে, ওইখানে ঘুরেছি। এটা সি এ ডি পি সৃষ্টি হবার আগে। অজিত (ড. অজিতনারায়ণ বসু) প্রস্তাবটা দিয়েছিল। এইখানে প্রথম গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ভূমি সম্পর্ক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বলতে কী বোঝায়, এইসব আমি প্রথম বুঝতে পারি। সি এম সি ও-তে চাকরির সময় একটা সার্ভে রিপোর্টে আমি বেলিলিয়াস রোডের বা ট্যাংরার ছোটো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কথা জানতে পারি। এছাড়া আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কাছ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিশনের রিপোর্ট পাই যা থেকে জানতে পারি পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা নিষ্ক্রিয় করতে লাগে চব্বিশ হাজার বছর। এগুলো ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়, লেখার মধ্যে চলে আসে।'[৭৪]

এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই 'ভোমা' নাটকের সৃষ্টি। তবে এই নাটকটি কারও জীবনকাহিনি নয়। নাটককার 'ভোমা' নাটকের 'মুখবন্ধ'-তেই স্পষ্ট করেছেন যে, এই নাটকে কোনও গল্প নেই। চারিপাশে যা দেখে শুনে তিনি বীতশ্রদ্ধ হন সেগুলিই কিছু টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে নাটকে পরিবেশন করেছেন। 'ভোমা' নামটা কেবল এই সব ছবির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করেছে। এই নাটকটি বাদল সরকারের একার রচনা নয়, তাঁর নাট্যদলের অনেকেরই অভিজ্ঞতা এখানে স্থান পেয়েছে।[৪] নাটকের ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

নাটকটিতে কোনও নির্দিষ্ট চরিত্র নেই, 'এক' 'দুই' করে 'ছয়' পর্যন্ত আছে। তারাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছে। নাটকটিতে ধরা পড়েছে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব, গ্রামের মানুষের অসহায়তা, শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের বিলাসিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সরকারের নীতি ও এজেন্ডা, পুঁজিবাদী শোষণ ইত্যাদি। নাটকটিতে একটি শহুরে মধ্যবিত্ত চরিত্রের কথা আছে—যে স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানিতে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করে।

মাইনে ৪৫৫ টাকা, ইংরেজি জানা থাকলে আর একটু বেশি হত। সেজন্য নিজের ছেলেকে কষ্ট করে প্রথমে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং পরে আই আই টি-তে পড়ানোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সন্তানকে পড়াতে কেবল তারই খরচ হবেনা, তার ছেলেকে পড়ানোর পিছনে আপামর দেশবাসীর করের টাকা জড়িত থাকবে। দেশ সম্পর্কে তার কোনও চিন্তা নেই, সমস্তটাই আত্মকেন্দ্রিক। নাটকে মহামায়া এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি নামে একটি ছোটো কারখানার প্রসঙ্গ এসেছে। যারা ডিজেল পাম্পসেট তৈরি করে এবং তা স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির নামে বাজারে বিক্রি হয়। এই স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির মতো বৃহৎ পুঁজির কোম্পানিগুলি মহামায়া এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মতো ছোট পুঁজির কোম্পানিগুলির সঙ্গে নগদে কারবার করে না। সেজন্য বাজারে ছোট কোম্পানিগুলির বহু টাকা ফেঁসে থাকে। ফলে স্বল্প পুঁজির এইসব কোম্পানিগুলি বেশিদিন নিজেদের কর্মসংস্থান এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ব্যাঙ্ক থেকেও 'লোন' সহজে তাদের জোটে না। নাটকেও দেখি এই সব কারণে মহামায়া এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি শেষপর্যন্ত নিলামে ওঠে এবং কিনে নেয় স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানি।

তবে নাটকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বের বিষয়টি। পল্লিশ্রীর দর্শন করাতে নাটককার নিয়ে গেছেন চব্বিশ পরগনা জেলার শিমুলপুর অঞ্চলের ভাদুরিয়া গ্রামে। যেখানে আড়াইশো পরিবারের বাস। ষাটটা পরিবারের জমি তিন বিঘের কম। নব্বইটা পরিবারের কোনও জমি নেই, চার টাকা মজুরিতে তারা জমিতে খাটে, কিন্তু রোজ কাজ জোটা মুশকিল। এক একটা পরিবারে পাঁচ ছয় দশজন করে পোষ্য, চার টাকায় রোজ চাল জোটে না। ফলে তারা জলে আটা গুলে নুন দিয়ে রেঁধে খায়। তাও না জুটলে উপবাসে দিন কাটে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি নেই, ডিজেল পাম্পসেটে কাজ চলে। কিন্তু ডিজেল মেলাও ভার, সার মেলে না ঠিক মতো, সারের দামও দ্বিগুন। কিন্তু এই গ্রামের উন্নয়নের কথা কেউ ভাবে না। অন্যদিকে কলকাতার রাস্তায় জল জমা নিয়ে, কম্পোজিট স্টেডিয়াম, হুগলি নদীর দ্বিতীয় সেতু, পাতাল রেলের দাবিতে লোকজন অত্যন্ত সরব। যার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। তাই নাটকে 'এক' অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলেছে—

'...যদি ইলেকট্রিসিটি আসে, যদি খালটা সংস্কার হয়, যদি আরো নলকূপ বসে—মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ, তবে সোনা ফলে যাবে সারা শিমুলপুর অঞ্চলের দশ হাজার বিঘে জমিতে'।[৭৫]

এসবের উপরে আছে জোতদারদের শোষণ। নাটকে গদাই মিত্র নামে এক জোতদারের প্রসঙ্গ আছে, যার আশি বিঘে জমি। যার নিজস্ব পাম্পসেট আছে। ছোট চাষিরা তার পাম্পসেট থেকে জল কিনে চাষ করে, ফলে জলের জন্য এক বড় পরিমান টাকা তাদের খরচ হয়। আবার চাষের জন্য যখন তাদের কাছে টাকা থাকে না তখন এই গদাই মিত্র সেই সব জমিকে ভাগে নিয়ে নিজের টাকায় চাষ করে এবং বিঘে প্রতি দুই বস্তা করে ধান জমির মালিককে দেয়।

গ্রামের উন্নয়নে এই সামান্য অর্থও বরাদ্দ হচ্ছে না, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের বক্তৃতায় বারবার প্রচার করছে—

'কৃষি এবং শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ আজ দৃঢ় পদক্ষেপে স্বয়ংনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে—এ কথা যারা অস্বীকার করে, তারা শুধু মুর্খের স্বর্গে বাস করছে তাই নয়, তারা পরোক্ষে ভারতবর্ষের শত্রুদেরই হাত শক্ত করছে।'[৭৬]

এই সব নেতারাই আবার দেশের যুবশক্তিকে ভুল পথে চালনা করে—নাটকে সে প্রসঙ্গও এসেছে। ভুয়ো জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে, চাকরি বা কোনও ব্যবসায়ের পারমিট দেওয়ার নামে দেশের ছাত্র-যুবদের নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। সামান্য টাকার বিনিময়ে তাদের সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে।

এসব কারণে প্রতিনিয়ত দেশের অর্থনীতি তলানিতে ঠেকছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। রোজগারের আশায় গ্রামের মানুষ শহরে চলে আসছে। কিন্তু সেখানেও তাদের মুক্তি ঘটেনি। নাটককার 'ভোমা' শব্দের অর্থ করেছেন এভাবে—

'ভোমা মানে জঙ্গল। ভোমা মানে আবাদ। ভোমা মানে গ্রাম।'[৭৭]

দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে এই ভোমাদের উপর। এরা যদি খেতে পায়, তাহলে দেশের আপামর জনগণ খেতে পাবে। এই ভোমাদের শোষণ করে বর্ধিত হয় শহর, শহরের বিলাসিতা। 'এক' গ্রামকে উন্নত করার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু সেই ডাকে শহরের মানুষ সাড়া দেয় না। আর ভোমারাও নিজের অধিকার বুঝতে পারে না। এই ভোমাদের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে চক্রান্তের বিষাক্ত জঙ্গল, যা ক্রমশ তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। শান্তির পথে এর থেকে নিস্তার ভোমাদের নেই। সেজন্যই নাটককার শেষপর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলনের পন্থাকেই একমাত্র মুক্তির পথ মনে করেছেন। নাটকের মধ্যে বার বার ধ্বনিত হয়েছে 'মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা, মাছের রক্ত ঠাণ্ডা' এবং নাটকের শেষে ভোমাদের উদ্দেশ্যে 'এক' উচ্চারণ করে এই সংলাপ—

> 'ক্ষুধা। ক্ষুধায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে ভোমা। ভিখিরি ভোমা। ওর কুড়ুলে মরচে ধরেছে। চারিপাশে আগাছা পরগাছার বিষাক্ত জঙ্গল বেড়ে উঠেছে। বিষ। বাতাসে বিষের গন্ধ। জিভে ভোমার রক্তের স্বাদ। ভোমার রক্ত খেয়ে আমরা হাসছি, খেলছি, দুকষ বেয়ে রক্ত ঝরছে, বিষগাছ বাড়ছে, বাড়ছে, আমার রক্ত, মানুষের রক্ত, ঠান্ডা হয়ে আসছে, ঠান্ডা- ঠান্ডা- ...জঙ্গল! জঙ্গল! বিষবন! কুড়ুল তোলো ভোমা! বড়ো ভারি, আমি পারছি না! তুমি তোলো ভোমা!'[৭৮]

মেঘের আড়ালে সূর্য :

নকশাল আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী পন্থা এবং শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতি সকল শ্রেণির জনগণের কাছে সমর্থন লাভ করতে পারেনি। পরবর্তী ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর তাদের আক্রমণ সেই মাত্রাকে আরও বেশি বৃদ্ধি করেছে। ফলে ক্রমশ নকশাল রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মহল এই রাজনৈতিক লাইন নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘের আড়ালে সূর্য' (১৯৭১) নাটকটি সেরকমই নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইনের সমালোচনায় লেখা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্কের বন্ধন সার্থক বিপ্লব জন্ম দিতে পারে—এখানেই নাটকটির মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে।

অধ্যাপক ভবেশ ও সুচেতার সন্তান সুখেনের জন্মদিন উদযাপনের দিনে নাটকের কাহিনি পরিবেশিত। সেই দিন উপলক্ষে তাদের ঘরে সুখেনের বন্ধু অরবিন্দ, সোমেন, কমলেশ, শেখর ও অনুপম এবং ভবেশের বন্ধু তথা ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনার্দন আগত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপের আদান-প্রদান এবং ঘরের বাইরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার ইঙ্গিত সেই সময়ের রাজনৈতিক পটভূমিকে স্পষ্ট করে। সুখেন এবং উল্লিখিত তার পাঁচ বন্ধু সি পি আই (এম)-এর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। নাটকে আর একটি চরিত্র সুখেনের বন্ধু সুনীত প্রথমে তাদের সঙ্গেই রাজনীতি করত, কিন্তু পরবর্তীতে সি পি আই (এম)-এর রাজনীতিতে আস্থা রাখতে না পেরে সে নকশাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার চোখে সুখেন সহ তার বাকি বন্ধুরা হয়ে উঠেছে নয়া-শোধনবাদী। এখানে তাদের সংলাপে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বটা প্রকাশ পায়—

> ‘সুচেতা : গত সনে এমন দিনে সুনীত তোদের মধ্যে ছিল। সারাদিন থেকে কত আনন্দ করল।
>
> অরবিন্দ : আমাদের সঙ্গে তার পোষাল না। আমরা নাকি নয়া-শোধনবাদী।
>
> শেখর : বন্দুকের নলে শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এখন।
>
> কমলেশ : পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়ার।
>
> অনুপম : জোতদার খুন কর।
>
> শেখর : বোমা মেরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দাও!’[৭৯]

নিজের আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে, মনের মধ্যে জাগ্রত প্রশ্নকে দাবিয়ে রেখে পার্টির সিদ্ধান্তের প্রতি যান্ত্রিক আনুগত্য রাখতে পারেনি বলেই সুনীতের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছিল। ফলে বৈপ্লবিক আবেগের তাড়নায় সে নকশালবাদী রাজনীতিতে প্রবেশ করে। সুখেনের মনেও পার্টি লাইনের উপর একাধিক প্রশ্ন জাগে। কিন্তু সে পার্টির মধ্যে থেকেই উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করে। কারণ সে মনে করে, তার প্রশ্ন মানে বহুজনের প্রশ্ন। এর জন্য সুখেন তার বন্ধুদের কাছে কিছুটা বিরাগভাজনের পাত্রও হয়েছে। রাজনীতির ময়দানে উভয় পক্ষই একে অপরকে নিজেদের শত্রু মনে করে। একে-অপরের রক্তে নিজেদের

হাত রঞ্জিত করতেও কেউ দ্বিধাবোধ করে না। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে ধর্মঘট, বন্ধ, মিছিলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

এরকম রাজনৈতিক সংকটের দিনে সব থেকে বেশি অচল হয়েছে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ, একাধিক পার্টির বারবার ধর্মঘট বা বন্ধের ডাক আবার নকশালদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করছে। জনার্দনের ইস্কুলে শিক্ষকদের তিনটি এবং ছাত্রদের তিনটি দলের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষে পড়াশুনা বন্ধ। উন্মত্ত ছাত্রের দল ইস্কুলের অফিসঘর ভেঙে তছনছ করে।

নাটককার এরকম উন্মত্ত ও হঠকারি রাজনীতিকে সমর্থন করেন না। ভবেশ ও সুচেতা সবসময় এই সহিংস রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করে। শ্রেণিশত্রু চিনতে এবং শ্রেণিসংগ্রামের পন্থা নির্ধারণ করতে যে ভুল হচ্ছে—তাদের সংলাপে এই বক্তব্যও জোরদার হয়ে উঠে। ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে কাছে টানার পন্থায় তারা বিশ্বাসী। সেজন্যই সুখেনের উন্মত্ত বন্ধু সহ একদল যুবক যখন সুনীতকে মারতে উদ্ধত হয় তখন সুচেতার মাতৃত্বের জোর সেখান থেকে সুনীতিকে বাঁচিয়ে এনেছে। শ্রেণিসংগ্রামের জন্য সম্পর্কের বদল হয়ে যাওয়ার তত্ত্বে সে বিশ্বাস করে না। আর নাটকের অন্তিমে ভবেশের কথায় ধরা পড়ে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে বিপ্লব সফল হতে পারে না।–

> ‘বিপ্লবের বীজ অঙ্কুর মেলে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের মনে। তাকে বাড়িয়ে দেওয়া সতেজ করাই বিপ্লবীর কাজ। শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, মানুষ।...বিপ্লব তো অঙ্কুর মেলেছে মাঠে খামারে, কলে কারখানায়, গরিবের ভাঙা ঘরে।’[৮০]

ঝড়ের পাখী :

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঝড়ের পাখী’ নাটকেও ধরা পড়েছে বিপ্লবী আন্দোলনে সংগঠনের গুরুত্ব। নাটকটি একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জ্ঞানবাবু সেই পরিবারের

কর্তা। তার চার সন্তান অহীন, সোমনাথ, শুভেন্দু ও টুকু চার ভিন্ন মত-প্রকৃতির চরিত্র। তাদের রাজনৈতিক চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন। বাড়ির বড়ো ছেলে অহীন ট্রেড ইউনিয়ানের রাজনীতি করে। সোমনাথ কোনও বিক্ষোভ-আন্দোলন-ধর্মঘটে বিশ্বাস রাখে না। সে মনে করে মালিকপক্ষের সঙ্গে আপস আলোচনার মধ্যে সামান্য কিছু হাশিল করতে—এখানেই অহীনের সঙ্গে তার বিরোধ। অহীন পাইয়ে দেওয়া, পুষিয়ে দেওয়া রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, সে চায় শ্রমিকরা রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের পূর্ণ অধিকারের প্রতিষ্ঠা। শুভেন্দু কোনও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়, সে সর্বদায় স্ফূর্তির মধ্যে জীবন কাটাতে চায়, 'ইয়াংকি কালচার' তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ছোটো ভাই টুকু নকশাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যে সদর্পে শুভেন্দুকে বলতে পারে—

> 'জেনে রাখ বুর্জোয়া সংস্কৃতির সব চিহ্ন আমরা মুছে ফেলব। ধ্বংস করে দেব তার শেষ অস্তিত্বটুকু। তোমাদের চোখ ফুটবে যখন দেখবে লেডিরা পাঁকের মধ্যে যন্ত্রণায় হাবুডুবু খাচ্ছে।'[৮১]

জ্ঞানবাবুর এই চার সন্তানের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সাতের দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বেরই বর্ণনা দেয়।

নাটকের কাহিনি অংশে দেখি নকশাল আন্দোলন দমন করতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চারিদিকে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দলের মধ্যে হিংসাত্মক লড়াই লেগেই আছে, পুলিশের গুলিতে মারা যাচ্ছে একের পর এক নকশাল কর্মী-সমর্থক। বিরোধী স্বরকে স্তব্ধ করতে প্রশাসন ও শাসকশ্রেণি বদ্ধপরিকর। যুবকরা দিগভ্রান্ত, পর্যাপ্ত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনও কর্মসংস্থান নেই, পেটের দায়ে ঘরের মেয়েরা বিপথগামী হচ্ছে, শিল্প-কারখানাগুলিতে চলছে লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটাই। তার প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকরা বিক্ষোভ, ধর্মঘট করলে পুলিশ এসে তা জোর পূর্বক ভেঙে দিচ্ছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মী।

সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জোতদারদের দখলি জমি উদ্ধার করে সেই জমিতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা নকশাল আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি ছিল। এই নাটকে সে প্রসঙ্গ এসেছে বিভূতি-অহীন-জ্ঞানবাবুর কথোপকথনে। জ্ঞানবাবুর বন্ধু বিভূতি

বেনামে বহু জমির সত্ত ভোগ করে। কিন্তু আন্দোলনের দরুন তার সেই জমি কৃষকরা দখল করেছে। ফলে তার মধ্যে জমি খোয়ানোর রোষ প্রকট—

'বিভূতি : গায়ের জোরে সব কিছু হবে। এই যে জোর করে জমি দখল করছে এটা কি জন্যে? কেস কর, মামলা লড়।

অহীন : কারা কেস করবে? কারা মামলা লড়বে কাকা? ঐ ভাগচাষীরা, বর্গাদাররা? যারা অর্ধেকদিন খেতে পায়না? আর কোর্ট করে ফয়শালা হতে হতে চাষীর ফ্যামিলি সুদ্ধ লোপাট হয়ে যাবে।

বিভূতি : তা বলে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া! একই মগের মুল্লুক নাকি!'[৮২]

নাটকের কাহিনি যত এগিয়েছে পরিপার্শ্বিক সংকট ততই ঘনীভূত হয়েছে। ইন্সপেক্টর অনিল দত্ত টুকুর পিছনে পড়েছে; উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাকে আটক করতে পারছে না। তাই সে জ্ঞানবাবুর বাড়িতে এসে হুমকির সুরে টকুর ব্যাপারে সকলকে সাবধানবাণী দিয়ে গেছে—যাতে তারা টুকুকে চরমপন্থী পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় হয়। সোমনাথ চরিত্রের মধ্যে আগাগোড়াই এক আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা ধরা পড়েছে। সে টুকুর অতিবিপ্লবী রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য নিজেকে বিপদে ফেলতে নারাজ। সেজন্য সে বাড়ি ছাড়তেও প্রস্তুত। নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে অহীন। তার মধ্যেই নাটককারের রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ পাই। টুকুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি অহীনের সহানুভূতি আছে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য টুকু যেই হঠকারি পন্থা অবলম্বন করেছে তার প্রতি অহীনের সমর্থন নেই। কারণ যে মনে করে একক প্রয়াসে বিপ্লবের সাফল্য আসতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন সাংগঠনিক প্রস্তুতি। সাধারণ মানুষকে বিপ্লবের মধ্যে যুক্ত করতে না পারলে তা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার সুযোগ নিয়ে শাসকবর্গ খুব সহজেই সেই বিপ্লব দমন করতে পারবে। এই আশঙ্কা থেকেই টুকুকে অহীন হঠকারিতার পথ ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুকু তার পথ ত্যাগ করেনি।

নাটকের অন্তিমে একদিকে রহমান খবর নিয়ে আসে অহীনের নেতৃত্বে যে কারখানায় শ্রমিকরা আন্দোলন করছিল সেখানে পুলিশ সন্ত্রাস চালিয়ে তা ছত্রভঙ্গ করে

দেয়, অন্যদিকে নকশাল আন্দোলন দমনে অতি সক্রিয় পুলিশি অভিযানে টুকু খুন হয়। এসব ঘটনার দরুন অহীন রহমানকে হতাশার সঙ্গে বলেছে—

> 'রহমান, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে তুচ্ছ করে দেখে, ভুল পথে ও একা লড়াই করতে চেয়েছিল। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ না করে, লড়াই করা যায় না। আর তাই অসময়ে আমার ভাইকে জীবন দিতে হল।'[৮৩]

স্টেডিয়াম নেই, হাততালি নেই :

সমীর চক্রবর্তী 'স্টেডিয়াম নেই, হাততালি নেই' নাটকের কাহিনিবৃত্তে নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি দিক তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কিছু শীর্ষ নেতৃত্বের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। নাটকের চরিত্রের মধ্যে আছে শোভনেন্দু সোম, সিদ্দিক, রফিক, শিউরণ, নিবেদিতা, হেলেনা।

শোভনেন্দু ছিল একজন নকশাল নেতা, যার ওজস্বিনী বক্তৃতার কারণে আন্দোলনকারীরা তাকে ট্রটস্কির সঙ্গে তুলনা করত। সিদ্দিক, রফিক, শিউরণ, নিবেদিতা তার অনুগামী হয়েই আন্দোলনে এসেছিল। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধে শোভনেন্দুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তারা প্রত্যেকেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। আর অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শোভনেন্দু নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। অতীতের বিপ্লবী নেতা শোভনেন্দু বর্তমানে হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণির একজন প্রতিভূ ব্যক্তি, আমেরিকান সংস্কৃতিতে নিজেকে রপ্ত করেছে। সে একজন প্রখ্যাত ফ্লিম ডিরেক্টর হয়েছে; পশ্চিমের দেশেও তার যথেষ্ট নামডাক। এমনকি সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গেও সে জড়িত— দশ বছর সংসদের মনোনীত প্রতিনিধি হয়েছে, কিছুদিন মন্ত্রীও থেকেছে। এগুলি সবই ছিল নকশালীয় রাজনৈতিক দর্শনের বিরোধী। দশ বছর কারাবাসের পর এক রাত্রে সিদ্দিক, রফিক, শিউরণ, নিবেদিতা শোভনেন্দুর বাড়িতে এসেছে তার বিশ্বাসঘাতকতার জবাব আদায় করতে। এই পটভূমিতে প্রতিটি চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনে স্মৃতির যে রোমন্থন করেছে সেখানেই উঠে আসে নকশাল আন্দোলনের নানা কথা। এর মধ্য

দিয়েই নাটককার আন্দোলনের পুনর্বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই সঙ্গেই চিনে নিতে চেয়েছেন শোভনেন্দুর মতো নেতৃত্বদের মানসিকতা।

আন্দোলনে যাওয়ার পূর্বে সিদ্দিক ছিল এক রোমান্টিক যুবক। শোভনেন্দু তাকে যুবশক্তির উদ্দামতার মোহ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখিয়ে হাতে বন্দুক তুলে নেওয়ার উৎসাহ জুগিয়েছিল। নিবেদিতার যখন বয়ঃসন্ধি, তখন তাকে নিজের প্রেমের জালে আবদ্ধ করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে আন্দোলনে যুক্ত করে। তাকে শোভনেন্দু বলেছিল—

'ঘর বাঁধা বিপ্লবের আগে নয়—
সব মেহনতী ইনসানের স্বপ্ন মিটলে
নিবেদিতা তুমি ঘর বেঁধো।'[৮৪]

রফিক ছিল চাষীর ঘরের সন্তান। আন্দোলনে শামিল হয়ে ডাকাতির দায়ে দশ বছর জেল খেটে অবশেষে জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দেখে তার অভাবে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। তার বাবা মারা গেছে এবং মা দারিদ্রে ক্ষুধার জ্বালায় দ্বিতীয় নিকে করেও বাঁচেনি। আর শিউরন ছিল চটকলের শ্রমিক। বৈপ্লবিক যুদ্ধে সে নিজের একটা পা হারায়। কিন্তু শোভনেন্দু এসবের জন্য নিজেকে দায়ী করে না। সে নির্দ্বিধায় বলে—

'ইতিহাস তোমাদের টেনে এনেছিল—
সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বে যে উত্তাপ জমে
সে উত্তাপ মানুষকে
ঘর থেকে ঘার ধরে বের করে দেয়—'[৮৫]

তাদের সংলাপে বারবার উঠে আসে দুজন বিপ্লবী ইন্দ্র চ্যাটার্জী ও লক্ষণ বাগদীর প্রসঙ্গ। ইন্দ্র চ্যাটার্জী মারা গেছিল প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে, আর লক্ষণ বাগদী গেরিলাযুদ্ধের সময় পুলিশের গুলি বিদ্ধ হয়ে। এই দুজনের নৃশংস পরিণতির জন্য দায়ী ছিল শোভনেন্দুর কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। এছাড়াও লক্ষণের মা মাতঙ্গিনীর প্রসঙ্গ উঠে আসে। যাকে

সকল বিপ্লবীরা পাভেলের মা-এর সঙ্গে তুলনা করে। এই মাতঙ্গিনী বৃদ্ধা অবস্থায় অনাহারে তিলতিল করে করে মারা যায়। কিন্তু তার কেউ খোঁজ রাখেনি। এই মাতঙ্গিনীর মধ্যে আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত বিপ্লবীদের মায়ের বা পরিবারের অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী শোভনেন্দুর বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তারা চারজন শোভনেন্দুর কাছে জানতে চেয়েছে শাসকশ্রেণির পুলিশের সঙ্গে যখন আত্রেয়ী নদীর তীরে সম্মুখ সমরে তারা সবাই যুদ্ধরত ছিল তখন শোভনেন্দু একা দলছুট হয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বারবার শোভনেন্দু সে প্রশ্ন এড়িয়ে যায়।

তাদের সংলাপে প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠে অতীতের বিপ্লবের দিনগুলি। গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ার চেষ্টায় শোভনেন্দু কৃষকদের মাঝে বক্তৃতা দেয়। সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীতে বিরামহীন রাজনৈতিক প্রচারে কর্মীদের মধ্যে শিথিলতা আসে। গোপন ঘাঁটিতে সরকার প্রতিষ্ঠায় দেরি হয়। 'মুজিব ব্রিগেড'-এর কাজ ছিল শত্রুর খবর নিয়ে আসা, কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হয়। শত্রুপক্ষের বহু গুপ্তচর বিপ্লবী ছদ্মবেশে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বিপ্লবী পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা থেকেও ক্রমশ বিচ্যুত হয়। অবশেষে শাসকের 'প্যারাট্রুপারের বাহিনী' শোভনেন্দুর নেতৃত্বে থাকা বিপ্লবী যোদ্ধাদের মূল কামান্ডোকে ঘিরে ফেলে এবং অন্যান্য কামান্ডো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা গেরিলা যুদ্ধ ছেড়ে মুখোমুখি সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। এমনকি শেষ মুহূর্তে শত্রুব্যূহ ভেদ করার পরিকল্পনাও তারা তৈরি করতে পারে। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে শোভনেন্দু সোম যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দলছুট হয়ে পুলিশকে তাদের গোপন ঘাঁটি ও পরিকল্পনা কথা জানিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে সমস্ত যোদ্ধারা আত্মসমর্পন করে এবং প্রত্যেকে গ্রেপ্তার হয়। একমাত্র শোভনেন্দু ছাড়া। এরকমই বহু কারণে নকশাল আন্দোলনের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়। কিন্তু শোভনেন্দুদের মতো ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে অন্য যুক্তি খোঁজে। তারা বলে—

'ইট ওয়াজ অ্যান ইম্ম্যাচিওরড বার্থ।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি

যথোচিত পরিপক্ক হবার আগেই

সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা ভুল হয়েছিল

বিপ্লবের কাঁচা ঘুম ভেঙে দিলে

বিপ্লব নিজেই নিহত হয়ে পড়ে।'[৮৬]

এভাবেই নাটককার এই নাটকটির মধ্যে খুঁজেছেন নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি দিক। আন্দোলনের মধ্যে শোভনেন্দুর মতো সৌখিন বিপ্লবীরা ভিড় করেছিল। যারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিপ্লবকে না দেখে 'রোম্যান্টিসাইজ' হয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। যারা সমাজের শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের ধারা না বুঝেই আবেগ তাড়িত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তারা নিজেদের দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারেনি। ফলে তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের চিহ্নিত করে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে আয়ত্বে আনতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার*, নীহাররঞ্জন বাগ(অনু.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৯২

২. মুখোপাধ্যায়, অরূপ, *উৎপল দত্ত : জীবন ও সৃষ্টি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, তৃতীয় পুর্ণমুদ্রণ, ২০১৯, পৃ-১১৮

৩. দত্ত, উৎপল; *তীর*, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০২১, পৃ-৪১৫

৪. ক. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশুনারি থিয়েটার*, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯-১০০

খ. দত্ত, উৎপল; *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*, নাট্যচিন্তা, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ-৪৩

৫. দত্ত, উৎপল; *তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৯

৬. তদেব, পৃ-২২৫-২২৬

৭. তদেব, পৃ-২২৭

৮. তদেব, পৃ-২২৭

৯. তদেব, পৃ-২২৮

১০. তদেব, পৃ-২৫৯

১১. Quentin, David and Brian Baggins (Transcription and Markup), *Quotations from Mao Tse Tung*, Peking Foreign Languages Press, Peking, 1966, Page-40

১২. দত্ত, উৎপল; *তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৫

১৩. তদেব, পৃ-২৭৭

১৪. তদেব, পৃ-২৮৫

১৫. Quentin, David and Brian Baggins (Transcription and Markup), *Quotations from Mao Tse Tung*, প্রাগুক্ত, Page-110

১৬. দত্ত, উৎপল; *তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৭

১৭. তদেব, পৃ-২৯১

১৮. তদেব, পৃ-২৯৮

১৯. তদেব, পৃ-২৯৭

২০. তদেব, পৃ-৩২৩

২১. ভৌমিক, অংশুমান, *এই শহর এই সময় এই থিয়েটার*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ-৮৬

২২. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, *রাজরক্ত*, পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ-৬৬

২৩. তদেব, পৃ-৭৮

২৪. তদেব, পৃ-১২৭-১২৮

২৫. ভট্টাচার্য, বিজন, *দেবীগর্জন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ-১১৫

২৬. ভৌমিক, অংশুমান, *এই শহর এই সময় এই থিয়েটার*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৮

২৭. তদেব, পৃ-৮৮

২৮. ভট্টাচার্য, বিজন, *চলো সাগরে*, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৭০, পৃ-'নান্দীপাঠ' অংশ

২৯. তদেব, পৃ-৩৮

৩০. তদেব, পৃ-৩৯

৩১. মিত্র, দীপক ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পা.), *ক্রোড়পত্র-কলকাতার হ্যামলেট*, অন্যকথা, দ্বাদশ সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৪৩০, পৃ-৬৮৩

৩২. বসু, অসিত, *থিয়েটার! থিয়েটার! এবং থিয়েটার!*, অন্যকথা, দ্বাদশ সংখ্যা, দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, পৃ-৫০৪

৩৩. তদেব, পৃ-৫০৪

৩৪. বসু, অসিত, *কলকাতার হ্যামলেট*, দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পা.), অন্যকথা, দ্বাদশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, পৃ-৬৮৬

৩৫. বসু, অসিত, *আমাদের হ্যামলেট—আমাদের কলকাতা*, অন্যকথা, দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, পৃ-৭৪৫

৩৬. বসু, অসিত, *কলকাতার হ্যামলেট*, প্রাগুক্ত, পৃ-৭০৪

৩৭. বসু, অসিত, *থিয়েটার! থিয়েটার! এবং থিয়েটার!*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০৪

৩৮. বসু, অসিত, *কলকাতার হ্যামলেট*, প্রাগুক্ত, পৃ-৭১২

৩৯. তদেব, পৃ-৭২৯

৪০. তদেব, পৃ-৭২৯

৪১. তদেব, পৃ-৭৪৩

৪২. মিত্র, দীলিপকুমার, *অনন্য নাট্যপুরুষ অমল রায়*, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমি পত্রিকা-১৫, আগস্ট ২০১২, কলকাতা, পৃ-২৩৮

৪৩. তদেব, পৃ-২৩৭

৪৪. রায়, অমল, *দালাল*, বজ্রনির্ঘোষের নাটক, উবুদশ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-৫২

৪৫. তদেব, পৃ-৫৩

৪৬. রায়, অমল, *দুই চোরের গপ্পো*, বজ্রনির্ঘোষের নাটক, উবুদশ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-১৬৫

৪৭. তদেব, পৃ-১৭০

৪৮. তদেব, পৃ-১৭১

৪৯. তদেব, পৃ-১৭৫

৫০. তদেব, পৃ-১৭৫

৫১. তদেব, পৃ-১৭৬

৫২. তদেব, পৃ-১৭৭

৫৩. তদেব, পৃ-১৮৫

৫৪. তদেব, পৃ-১৮৫

৫৫. কাশীপুর-বরানগর গণহত্যার ৫০ বছর অতিক্রান্ত, বিচার অধরাই থেকে গেল

https://www.ba.cpiml.net/index.php/Deshabrati/2021/08/50-years-have-passed-since-the-Kashipur-Baranagar-genocide

৫৬. রায়, অমল, *আট জোড়া খোলা চোখ,* নকশালবাড়ী আন্দোলনের নাট্য সমগ্র, মিলন গোপাল গোস্বামী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৩৭৬

৫৭. তদেব, পৃ-৩৭৪

৫৮. তদেব, পৃ-৩৭৭

৫৯. তদেব, পৃ-৩৮২

৬০. তদেব, পৃ-৩৮২

৬১. রায়, অমল, *যেখানেই অত্যাচার,* বজ্রনির্ঘোষের নাটক, উবুদশ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-২২৬

৬২. রায়, অমল, *পঙ্কজ দত্ত আসছেন,* নকশালবাড়ী আন্দোলনের নাট্য সমগ্র, মিলন গোপাল গোস্বামী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৩২৯

৬৩. তদেব, পৃ-৩৩৩

৬৪. তদেব, পৃ-৩৪৩

৬৫. বিশ্বাস, মনোরঞ্জন, *পদাতিক*, মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ-৪৬

৬৬. তদেব, পৃ-৬৬

৬৭. তদেব, পৃ-৭৭

৬৮. সরকার, বাদল, *লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী*, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ-২৪২

৬৯. তদেব, পৃ-২৪৮

৭০. তদেব, পৃ-২৫৩

৭১. সরকার, বাদল, *নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র*, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ-২৬৯

৭২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক (সম্পা.), *বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার*, থীমা, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০২২, পৃ-৭৩

৭৩. সরকার, বাদল, *ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার*, ঋতদীপ ঘোষ (অনু. ও সম্পা.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ২০১২, পৃ-৬৬

৭৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক (সম্পা.), *বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার*, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৭-১২৮

৭৫. সরকার, বাদল, *ভোমা*, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ-৩০১

৭৬. তদেব, পৃ-৩০৫-৩০৬

৭৭. তদেব, পৃ-২৯৮

৭৮. তদেব, পৃ-৩৩১

৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, *মেঘের আড়ালে সূর্য,* বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ, অজিতকুমার ঘোষ (সং. ও সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ-১১৮

৮০. তদেব, পৃ-১২৮

৮১. চট্টোপাধ্যায়, শুকদেব, *ঝড়ের পাখী,* একালের একাংক, চতুর্থ খণ্ড, সুনীল দত্ত (সম্পা.), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ-২৫৬

৮২. তদেব, পৃ-২৬১

৮৩. তদেব, পৃ-২৮১

৮৪. চক্রবর্তী, সমীর, *স্টেডিয়াম নেই, হাততালি নেই,* নকশালবাড়ী আন্দোলনের নাট্য সমগ্র, মিলন গোপাল গোস্বামী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৪২৯

৮৫. তদেব, পৃ-৪৩০

৮৬. তদেব, পৃ-৪৩২